সপ্তম অধ্যায় ঃ যোগাযোগ

৭.০. ভূমিকা -

ঘরে-বাইরের প্রায় এক দশক পর *যোগাযোগ* রচিত। ১৯২৭ - ২৯ যোগাযোগের রচনাকাল ১৩৩৪ সালের আশ্বিন থেকে ১৩৩৫ সালের চৈত্র পর্যন্ত বিচিত্রা পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে *যোগাযোগ* প্রকাশিত হয়। গ্রন্থাকারে প্রকাশ ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ, ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে। এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ অনেকটা পেছনে ফিরে এমন যুগের মানুষদের তাঁর উপন্যাসে নিয়ে এলেন যারা 'সেই যুগের যেখানথেকে প্রাচীন কাল সরতে আরম্ভ করেছে, কিন্তু নবীন যুগের আসন এখনো পাতা হয় নি'। গল্পকালের থেকে প্রায় এক শতাব্দী ব্যবধানে রবীন্দ্রনাথ যখন লিখছেন, সে-সময় বাংলাদেশের বিত্তজগতে যুগসন্ধির সহজ বৈপরীত্যের টানাপোড়েন ভেতরে-বাইরে উত্তাল। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত, এমনকি অপেক্ষাকৃত উচ্চবিত্ত সমাজের বহুলাংশে ক্ষয় হতাশা এবং অবদমনের চাপ জীবনের প্রায় সাধারণ লক্ষণ হয়ে দেখা দিয়েছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রবল অভিঘাতে জীবনের বহুযত্নলালিত মূল্যবোধগুলিও প্রশ্নচিহ্নের সামনে কম্পিত। সাহিত্যে 'কল্লোল' অনুষঙ্গী জীবনের অভিঘাত উতরোল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় থেকে গ্রামীণ জমিদারী ব্যবস্থার প্রচলিত আভিজাত্যের যে বিপর্যয় শুরু হয়েছিল, এ সময় তা স্পষ্ট। সামাজিক ভাবে বাঙালি সমাজের সর্বমুখী অবক্ষয় অবসাদ আর কোনভাবেই প্রচ্ছন্ন থাকতে চাইছিল না, দিনের আলোর মত পরিস্কার ভাবে দেখা দিচ্ছিল। এহেন সময়ে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ সামন্তসমাজের বিলুপ্তি এবং ধনদাবী সমাজের পূর্বরূপ বণিকশ্রেণীর উদ্ভবের সন্ধিলগ্নটিকে তাঁর উপন্যাসে চিত্রিত করেছেন। স্মরণীয় উপন্যাসটি প্রথম রবীন্দ্রনাথ লিখতে শুরু করেন *তিন পুরুষ* নাম দিয়ে। তিন পুরুষের উত্থান পতনের কাহিনী। মধুসূদনের পিতা আনন্দ ঘোষাল যার প্রথম পুরুষ, তৃতীয় পুরুষ মধুসূদনের পুত্র বত্রিশ বছর বয়স্ক অবিনাশ ঘোষাল। আর সে গল্পের পূর্ববর্তী গল্প ছিল নুরনগরের ভূম্যধিকার নিয়ে চাটুজ্যে-ঘোষালদের সার্বিক দ্বন্দ্বের - যার পরিণামে ভিটেমাটি ছাড়া ঘোষালেরা অবশেষে রজবপুরবাসী;

চাটুজ্যেরাও হৃতমূল। 'দেশ-কালে ব্যাপ্ত পুরুষানুক্রমিক বিস্তারের এ কাহিনীতে মহাকাব্য সম্ভাবনা ছিলই একটা'।'শোনা যায় রবীন্দ্রনাথ নাকি *যোগাযোগ*এর পরবর্তী অংশ লিখতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সম্ভব হয়ে ওঠেনি'।[১] কিন্তু কি হতে পারত কিন্তু হয়ে উঠল না, তার অন্বেষণ আমাদের পাঠের উদ্দেশ্য নয়। বরং হওয়ার উপাদান ছিল এবং হয়ে না ওঠা জনিত অভিঘাত যা শেষ পর্যন্ত হয়ে উঠল তাতে কিভাবে প্রভাব ফেলেছে, তা আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। এ প্রসঙ্গে আসার আগে আমরা বরং লক্ষ্য করতে পারি কুমুদিনীর মধ্যদিয়ে রবীন্দ্রনাথ কোন বার্তা সেদিন আমাদের দিতে চেয়েছিলেন এবং পুনঃপাঠের মধ্য দিয়ে কুমুদিনী কিভাবে আজকের দিনে নারীচেতনাবাদীর কাছে প্রেরণার আদি উৎসরূপে গৃহীত হতে পারে।

- ১ -

৭.১. কুমুদিনী ঃ নারীর স্ত্রীত্ব ও ব্যক্তিত্বের যোগ ও অযোগের আখ্যান -

নারীর স্ত্রীত্ব এবং ব্যক্তিত্ব যে সমার্থক নয়, এই মোক্ষম প্রশ্নটি *যোগাযোগ* উপন্যাসে উপস্থাপিত। *ঘরে-বাইরে*র মতো *যোগাযোগ*ও দাম্পত্যসম্পর্ক বিষয়ক কাহিনী। থিম এর দিক থেকে আপাতদৃষ্টিতে দুটি উপন্যাসের সাদৃশ্য থাকলেও উপন্যাস দুটির অন্তর্নিহিত সমস্যার প্রভেদ বিস্তর। *ঘরে-বাইরে*তে নিখিলেশ স্বামীত্বের অধিকারে বিমলাকে কেবলমাত্র স্ত্রী রূপে পেতে চায় নি, পেতে চেয়েছে ব্যক্তি বিমলাকে। বিপরীত দিক থেকে নিখিলেশ চেয়েছে বিমলাও তাকে শুধুমাত্র স্বামী আইডিয়া রূপে নয়, বরং গ্রহণ করুক ব্যক্তি রূপে। অপরদিকে *যোগাযোগ*এ কুমুদিনী নিছক স্বামী আইডিয়ার মধ্যদিয়েই যদি মধুসূদনকে দেখত তবে কোনো সংকটই তৈরি হত না, সংকট তৈরি হয়েছে যখন স্বামী আইডিয়ার মায়াঞ্জন ত্যাগ করে ব্যক্তি মধুসূদনকে কুমুদিনী দেখতে চেয়েছে। দুটি উপন্যাসেই রবীন্দ্রনাথের লক্ষ্য স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ককে ব্যক্তি নারী-পুরুষের সম্পর্কে উত্তরণ। প্রকরণগত দিক দিয়ে দেখলে *ঘরে-বাইরে* উত্তমপুরুষের জবানিতে আত্মকথনরীতিতে বিবৃত, আর *যোগাযোগ* বিবৃত হয়েছে সর্বজ্ঞ লেখকের জবানিতে।

তবে লক্ষণীয় *যোগাযোগ* সর্বজ্ঞ লেখকের দৃষ্টিকোণ থেকে বিবৃত হলেও কুমুর ব্যক্তিত্বের উন্মোচন, তার মানসিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতের প্রসঙ্গ যখনই উপন্যাসটিতে এসেছে, তখনই সর্বজ্ঞ লেখকের দৃষ্টিকোণ যেন কুমুর নিজস্ব দৃষ্টিকোণের সাথে মিশে যেতে চেয়েছে। নারীচেতনাবাদী পাঠে উপন্যাসের প্রকরণগত এই দিকটি তাৎপর্যপূর্ণ।

৭.১.১. বিমলা থেকে কুমুদিনী ঃ মুক্তির খোঁজে -

সমালোচক রবীন্দ্রনাথ গুপ্ত লিখেছেন - " এই উপন্যাসেই প্রথম সামন্তসমাজ বনাম সদ্যোত্থিত বনিকতন্ত্রের সংঘাত অঙ্কিত হলো।"[২] বস্তুত কুমুদিনী ও মধুসূদনের ব্যক্তিত্বের যে বৈপরীত্য, তা দুটি সমাজ পরিবেশ উত্থিত। সভ্যতার রথ সামন্ততন্ত্র থেকে ধনতন্ত্রে পৌঁছলেও নারীর অবস্থানের যে বিশেষ কোনো পরিবর্তন হয় না, বৈশ্যযুগের প্রতিনিধি মধুসূদনের সাথে কুমুদিনীর দাম্পত্য অসঙ্গতি যেন সে দিকেই ইঙ্গিত করে। *ঘরে-বাইরে* উপন্যাসে আমরা লক্ষ্য করেছি সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোয় যখন 'ভোগের সংসারে খুব অল্প স্ত্রীই যথার্থ স্ত্রীর সম্মান পেয়েছে', তখন সেই বংশের ছেলে নিখিলেশ 'এমন মানী সংসারের তরীটাকে একটিমাত্র স্ত্রীর আঁচলের পাল তুলে দিয়ে চালানোর' অপবাদ সহ্য করেও স্ত্রী-ব্যক্তিত্বের মুক্তি বিধায়ক হয়েছে। কিন্তু সামন্ততান্ত্রিক কাঠামো থেকে মুক্তিই যে নারীমুক্তির প্রেক্ষাপট রচনা করতে পারে না, অন্ততঃ ভারতবর্ষের সামাজিক প্রেক্ষিতে, *যোগাযোগ* উপন্যাসে তা স্পষ্ট। অশ্রুকুমার সিকদারের প্রাসঙ্গিক মন্তব্য উদ্ধৃতিযোগ্য - "যোগাযোগে দেখানো হল, ঘরে-বাইরে থেকে এক পদক্ষেপ এগিয়ে, যে ঐ সামন্ততন্ত্র থেকে মুক্তিই শেষ কথা নয়, পরিণাম যদি হয় আর এক তন্ত্রের বন্দীত্ব। কুমু ধরা পড়ল ধনতন্ত্রের মধুসূদনের হাতে। ... যে মধুসূদনের 'ভাগ্যচক্রের সব গ্রহনক্ষত্রই বৈশ্যবর্ণ' সেই মধুসূদনের সঙ্গে বিয়ে হল কুমুর - বোঝা গেল সামন্ততন্ত্র থেকেই মুক্তি শেষ কথা নয়। মুক্তি আরো দূরে।"[৩] এভাবে দেখলে মনে হয় স্বদেশী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে রচিত *ঘরে-বাইরে*র পরবর্তী উপন্যাস *যোগাযোগ*এ রবীন্দ্রনাথ উনিশ শতকের পটভূমিতে ফিরে গেলেও এটা রবীন্দ্রনাথের কোনো পশ্চাৎগমন নয়, বরং *ঘরে-বাইরে*

উপন্যাসে উপস্থাপিত সমস্যারই পরবর্তী বিন্যাস।

৭.১.২. কুমুদিনী ঃ পুনঃপাঠের আলোকে -

নারীব্যক্তিত্বের প্রতি রবীন্দ্রনাথের চূড়ান্ত শ্রদ্ধার্ঘ্যর অভিজ্ঞান কুমুদিনী। সংসারের অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে নারীব্যক্তিত্বের যে নীরব অথচ বলিষ্ঠ বিদ্রোহ *পয়লানম্বর* (আষাঢ়-১৩১৪), *অপরিচিতা* (কার্তিক-১৩২১), *হৈমন্তী* (জ্যৈষ্ঠ-১৩২১), *স্ত্রীর পত্র* (শ্রাবণ-১৩২১) প্রভৃতি গল্পে বিভিন্নভাবে চিত্রিত হয়েছে, কুমুদিনীতে তা যেন সংঘত রূপ ধারণ করেছে। মানসীর *নারীর উক্তি* (১২৯৪) কবিতায় উচ্চারিত-

" আছি যেন সোনার খাঁচায়
একখানা পোষ-মানা প্রাণ।
এও কি বুঝাতে হয় প্রেম যদি নাহি রয়
হাসিয়ে সোহাগ করা শুধু অপমান?...
অপবিত্র ও করপরশ
সঙ্গে ওর হৃদয় নহিলে।
মনে কি করেছ বঁধু, ও হাসি এতই মধু
প্রেম না দিলেও চলে, শুধু হাসি দিলে।"[৪]

মধুসূদনের সোনার খাঁচায় প্রেমহীন, মনহীন শরীর নিয়ে অপবিত্র করপরশের গ্লানি বহন করে 'পোষ মানা প্রাণ' হয়ে থাকার মধ্যে নারীত্বের যে অপমান, এর বিরুদ্ধে কুমুদিনীর প্রতিবাদ। আজও আমাদের সমাজমনে স্ত্রীত্বের কৃষ্ণগহ্বরে নারীব্যক্তিত্বের বিলীন হয়ে যাবার যে প্রবণতা বিদ্যমান, কুমুদিনী এর বিরুদ্ধে জ্বলন্ত প্রত্যাহ্বান। লক্ষণীয় আর পাঁচটি সাধারণ নারীর মতো কুমুও স্বামী সম্পর্কে শাস্ত্রচালিত সংস্কার নিয়ে দাম্পত্য জীবনে প্রবেশ করলেও নারীব্যক্তিত্ব যে স্ত্রীত্বর চেয়েও বড়, ক্রমশঃ এই বোধে উত্তীর্ণ হয়েছে। আজও যখন অসংখ্য নারী শাখা-সিঁদুরের দিব্যি নিয়ে তাদের অচেতনেই হয়তো দাম্পত্য সংস্কারের অলস অভ্যাসে

প্রতি মুহূর্তে বলি দিচ্ছে নিজেদের ব্যক্তিত্বকে এক সর্বগ্রাসী স্ত্রীত্বের আইডিয়ার মধ্যে, তখন পুনঃপাঠের মধ্য দিয়ে নতুনভাবে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে কুমুদিনী। আমরা কুমুদিনীকে বুঝে নিতে চাই সমাজে আজও স্ত্রীত্বের জাঁতাকলে প্রতি মুহূর্তে পিষ্ট হতে থাকা নারীব্যক্তিত্বের করুণ পরিণামের বাস্তব প্রেক্ষিতে।

কলকাতা শহরে জলের কল চালু হয় ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের আগে। মধুসূদনের কলকাতার বাড়িতে জলের কল ছিল। এই সূত্রে অমরেশ দাশ নির্ণয় করেছেন, 'যোগাযোগ উপন্যাসের কাহিনি উনিশ শতকের শেষ তিন দশকের কোনো এক সময়ের'।[৫] অর্থাৎ কুমু-মধুসূদনের গল্পকাল গোরা ও নৌকাডুবির গল্পকালের সমসাময়িক। সুচরিতা-ললিতা-হেমনলিনী ও কুমুদিনী এরা সকলেই প্রায় একই সময়ে কলকাতায় বসবাস করলেও এবং এরা সকলেই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধে উজ্জ্বল হলেও কুমুদিনীর জগৎ এদের জগৎ থেকে আলাদা। 'জন্ম-একলা' কুমুদিনীর চৈতন্যের ভূমিগর্ভে প্রাচীন ভারত ছিল অবিচলিত। ঔপন্যাসিকের বর্ণনায় -

> " কুমুদিনী ঘরে পড়াশুনো করেছে। বাইরের পরিচয় নেই বললেই হয়। পুরোনো নতুন দুই কালের আলো-আঁধারে তার বাস। তার জগৎটা আবছায়া - সেখানে রাজত্ব করে সিদ্ধেশ্বরী, গন্ধেশ্বরী, ঘেঁটু, ষষ্ঠী; সেখানে বিশেষ দিনে চন্দ্র দেখতে নেই; শাঁখ বাজিয়ে গ্রহণের কুদৃষ্টিকে তাড়াতে হয়, অম্বুবাচীতে সেখানে দুধ খেলে সাপের ভয় ঘোচে; মন্ত্র প'ড়ে, পাঁঠা মানত ক'রে, সুপুরি আলো-চাল ও পাঁচ পয়সার সিন্নি মেনে, তাগাতাবিজ প'রে, সে জগতের শুভ-অশুভের সঙ্গে কারবার; স্বস্ত্যয়নের জোরে ভাগ্য-সংশোধনের আশা - সে আশা হাজারবার ব্যর্থ হয়। প্রত্যক্ষ দেখা যায়, অনেক সময়েই শুভলগ্নের পাখায় শুভফল ফলে না, তবু বাস্তবের শক্তি নেই প্রমাণের দ্বারা স্বপ্নের মোহ কাটাতে পারে। স্বপ্নের জগতে বিচার চলে না, একমাত্র চলে মেনে-চলা। এ জগতে দৈবের ক্ষেত্রে যুক্তির সুসংগতি, বুদ্ধির কর্তৃত্ব ভালো-মন্দর নিত্যতত্ব নেই বলেই কুমুদিনীর মুখে এমন একটা করুণা।" (পরিচ্ছেদ - ৩)

কুমুদিনীর মধ্যে শাস্ত্রশাসিত ঐতিহ্যিক পাতিব্রত্য এবং নতুন যুগের স্বাধীন ব্যক্তিত্ববোধের যে বিচিত্র সহাবস্থান ঘটেছে, তা অস্বাভাবিক নয়, দুর্লভ হয়তো। কুমুর মধ্যে যেন দুটো যুগের যোগাযোগ ঘটেছে। *যোগাযোগ* উপন্যাস তাই শুধুমাত্র দুটি ভিন্ন প্রকৃতির নারী-পুরুষের দাম্পত্য অসংগতির গল্প নয়, বরং দুটি ভিন্ন স্বভাববিশিষ্ট নর-নারীর ব্যক্তিত্বও কিভাবে দুটি যুগের মূল্যবোধের যোগাযোগের আধার হয়ে উঠতে পারে - তারও চিত্রায়ন।

দাদা বিপ্রদাসের সাহচর্যে বিদ্যাচর্চা ও সংগীতশিক্ষার সাথে সাথে কুমুদিনী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে দীক্ষিত হলেও পুরোনো কালেই সে তার নিশ্চিন্ত আশ্রয় খুঁজে নিয়েছে। ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্র-শাসিত যে জগতে কুমুর বাস, পজিটিভিস্ট দাদা তাকে কালোচিত জীবনবোধে দীক্ষিত করলেও সেই কল্পজগতের থেকে কুমুকে টলাতে পারে নি। কেননা 'যেখানে কার্যকারণের যোগাযোগ নেই' সেখানে তর্ক করা যায় না, 'অমাবস্যার সঙ্গে কুস্তি করা চলে না'। আর এ কারণেই 'এই জায়গাতেই ভাইবোনের মধ্যে অসীম প্রভেদ। কুমুর চিত্তের এ অন্ধকার মহলে ওর উপর দাদার একটুও দখল নেই'। 'দাদার উপর তার অসীম ভক্তি' থাকলেও দৈববাণীর ওপর দাদার অশ্রদ্ধাকে কুমু মেনে নিতে পারে নি, 'কুমুদিনী জানে এইখানেই দাদার দৃষ্টির ক্ষীণতা'। দুই যুগের দুই ভিন্নমুখী টানে দ্বিধান্বিত কুমুদিনীর মানসগঠন ঔপন্যাসিকের বর্ণনায় স্পষ্ট।

পুরাণ ও শাস্ত্র-শাসিত মানসিকতায় বিবাহের পূর্ব থেকেই কুমুদিনী নিজেকে নিবেদন করেছিল স্বামী নামক এক নৈর্ব্যক্তিক ভাবাদর্শে। পৌরাণিক আখ্যানপুষ্ট কুমুদিনীর কল্পস্বর্গে পতিদেবতা শিবতুল্য, দাম্পত্য মানে তপস্বিনী উমার সাথে যোগীশ্রেষ্ঠ মহাদেবের মিলন। এ কারণেই বিবাহ ব্যাপারে নিজের পছন্দ বলে যে একটা উপসর্গ আছে এ চিন্তা কখনো কুমুদিনীর মাথায় আসে নি। স্বামীকে নৈর্ব্যক্তিক ভাবাদর্শে দেখার প্রবণতা কুমুর মধ্যে বিভিন্ন সময় লক্ষ্য করা গেছে -

ক. "মা কি ছেলে বেছে নেয়? ছেলেকে মেনে নেয়। কুপুত্রও হয় সুপুত্রও হয়। স্বামীও তেমনি।

বিধাতা তো দোকান খোলেন নি। ভাগ্যের উপর বিচার চলবে কার?" (পরিচ্ছেদ - ১০)

খ. "বিপ্রদাস বুঝেছে, কী একটা দৈব-সংকেত কুমু মনের মধ্যে বানিয়ে বসেছে। কথাটা সত্য। আজই সকালে ঠাকুরকে উদ্দেশ করে মনে মনে বলেছিল, এই বেজোড় সংখ্যার ফুলে জোড় মিলিয়ে সব-শেষে যেটি বাকি থাকে তার রঙ যদি ঠাকুরের মতো নীল হয় তবে বুঝব তাঁরই ইচ্ছা। সব শেষের ফুলটি হল নীল অপরাজিতা।" (পরিচ্ছেদ - ১১)

গ. "রাত্রে বিছানায় বসে প্রণাম করে , সকালে উঠে বিছানায় বসে আবার প্রণাম করে। কাকে করে সেটা স্পষ্ট নয় - একটি নিরবলম্ব ভক্তির স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছ্বাস।" (পরিচ্ছেদ - ১২)

ঘ. "এখন থেকে ও মনে মনে জোরের সঙ্গে জপতে লাগল, তিনি ভালোই হন, মন্দই হন, তিনি আমার পরম গতি।

দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনা সুখেষু বিগতস্পৃহঃ

বীতরাগভয়ক্রোধঃ -

শুধু যতিধর্মের নয়, সতীধর্মেরও এই লক্ষণ। সে ধর্ম সুখদুঃখের অতীত - তাতে ক্রোধ নেই, ভয় নেই। আর অনুরাগ? তারই বা অত্যাবশ্যকতা কিসের? অনুরাগে চাওয়া-পাওয়ার হিসেব থাকে, ভক্তি তারও বড়ো। তাতে আবেদন নেই নিবেদন আছে। সতীধর্ম নৈর্ব্যক্তিক, যাকে ইংরেজিতে বলে ইম্পার্সোনাল। মধুসূদন ব্যক্তিটিতে দোষ থাকতে পারে, কিন্তু স্বামী-নামক ভাব-পদার্থটি নির্বিকার নিরঞ্জন। সেই ব্যক্তিকতাহীন ধ্যানরূপের কাছে কুমুদিনী একমনা হয়ে নিজেকে সমর্পণ করে দিলে।" (পরিচ্ছেদ - ১৩)

ঙ. "মধুসূদনকে যতই সে হৃদয়ের মধ্যে গ্রহণ করতে বাধা পায়, ততই তার দেবতাকে দিয়ে সে তার স্বামীকে আবৃত করতে চায়। স্বামীকে উপলক্ষ করে আপনাকে সে দান করছে তার দেবতাকে। দেবতা তাঁর পূজাকে বড়ো কঠিন করেছেন, এ প্রতিমা স্বচ্ছ নয়, কিন্তু এই তো ভক্তির পরীক্ষা। শালগ্রামশিলা তো কিছুই দেখায় না, ভক্তি সেই রূপহীনতার মধ্যে বৈকুণ্ঠনাথের রূপকে প্রকাশ করে কেবল আপন জোরে। যেখানে দেখা যাচ্ছে না সেইখানেই দেখব এই হোক আমার সাধনা, যেখানে ঠাকুর লুকিয়ে থাকেন সেইখানে গিয়েই তাঁর চরণে আপনাকে

দান করব, তিনি আমাকে এড়াতে পারবেন না।" (পরিচ্ছেদ - ২৩)

পুরাণ ও শাস্ত্রের পাশাপাশি কুমুদিনীর মানসগঠনে তার অভিমানী মা নন্দরানীর স্মৃতি, তার বাবার প্রতি মায়ের ব্যবহার প্রবলভাবে ক্রিয়াশীল ছিল। এ-কারণেই ৩৭-সংখ্যক পরিচ্ছেদে 'শুতে আসবে না বড়োবউ'- মধুসূদনের এই আহ্বান আহত কুমুদিনীর মনে মন্ত্রের মতো কাজ করে - "হঠাৎ একটা চিরপরিচিত সুর তার মনে পড়ে গেল - তার বাবা স্নিগ্ধ গলায় কেমন করে তার মাকে বড়োবউ বলে ডাকতেন। সেই সঙ্গেই মনে পড়ল - মা তার বাবাকে কাছে আসতে বাধা দিয়ে কেমন করে চলে গিয়েছিলেন। এক মুহূর্তে তার চোখ ছলছলিয়ে এল - মাটিতে মধুসূদনের পায়ের কাছে বসে পড়ে বলে উঠল, আমাকে মাপ করো।" কিংবা "ঐ বড়োবউ শব্দটা কুমুর মনে মন্ত্রের মতো কাজ করে। নিজের মধ্যে তার মায়ের জীবনের অনুবৃত্তি হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। এই ডাকে তার মা কতদিন কত সহজে সাড়া দিয়েছিলেন, তারই অভ্যাসটা যেন কুমুরও রক্তের মধ্যে। তাই চকিতে সে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ালো।"

পুরাণ-শাস্ত্র ও তার রক্তকণিকায় প্রবাহিত মায়ের স্মৃতি প্রভৃতি বিবিধ প্রভাবে গঠিত কুমুদিনী যখনই মধুসূদনের রূঢ় ব্যবহারে ব্যথিত হয়েছে, তার অন্তরাত্মা বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে, ততবারই সে প্রাণপণে চেষ্টা করেছে তার সযত্নলালিত স্বামী-আইডিয়া দিয়ে মধুসূদনকে আবৃত করতে। এই প্রচেষ্টায় বার বার সে ব্যর্থ হওয়ায় তার অন্তরাত্মা হয়েছে বেদনাদীর্ণ। ব্যক্তি কুমুদিনী আইডিয়ার জগতে আশ্রয় নেওয়ায় মধুসূদনের রূঢ় ব্যবহারে আহত হলেও পরক্ষণে অনুতপ্ত মধুসূদনের আহ্বানে তার মনে হয়েছে - 'এ দৈবেরই লীলা'। অথচ আইডিয়ার সাথে তার বাস্তবকে কোনোমতেই মেলাতে না পারায় ৩২ সংখ্যক পরিচ্ছেদে 'বড়োবউ ঠাণ্ডা লাগবে, ঘরে এসো' প্রেমিক মধুসূদনের এই আহ্বানে 'অন্তরের মধ্যে কুমু যে বাণী শুনতে চায়, তার সঙ্গে এ কণ্ঠের সুর' মেলে নি। ব্যক্তিত্ব সচেতন কুমুদিনী কিভাবে তার বিদ্রোহী সত্তাকে শাস্ত্রশাসনে নিমজ্জিত করতে চেয়েছে, ৩৩ সংখ্যক পরিচ্ছেদে তা স্পষ্ট বিবৃত -

"যেখানে কুমু ব্যক্তিগত মানুষ সেখানে যতই তার মন ধিক্কারে ঘৃণায় বিতৃষ্ণায় ভরে উঠছে, যতই তার সংসার সেখানে আপন গায়ের জোরের রূঢ় অধিকার তাকে অপমানিত করছে ততই সে আপনার চারিদিকে একটা আবরণ তৈরি করছে। এমন একটা আবরণ যাতে করে নিজের কাছে তার ভালো-লাগা মন্দ-লাগার সত্যতাকে লুপ্ত করে, অর্থাৎ নিজের সম্বন্ধে নিজের চৈতন্যকে কমিয়ে দেয়। এ হচ্ছে ক্লোরোফর্মের বিধান। কিন্তু এ তো দু-তিন ঘন্টার ব্যবস্থা নয়, সমস্ত দিনরাত্রি বেদনাবোধকে বিতৃষ্ণাবোধকে তাড়িয়ে রাখতে হবে। এই অবস্থায় মেয়েরা যদি কোনোমতে একজন গুরুকে পায় তবে তার আত্মবিস্মৃতির চিকিৎসা সহজ হয়; সে তো সম্ভব হল না। তাই মনে মনে পূজার মন্ত্রকে নিয়তই বাজিয়ে রাখতে চেষ্টা করল। তার এই দিনরাত্রির মন্ত্রটি ছিল -

তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং
প্রসাদয়ে ত্বাম্ অহমীশমীড্যং
পিতেপ পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ
প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢুম্।

... কুমু চোখ বুজে মনে মনে তাঁকে ডেকে বলে, তুমি তো বলেছ, যে মানুষ আমাকে সব জায়গায় দেখে, আমার মধ্যে সমস্ত দেখে, সেও আমাকে ত্যাগ করে না, আমিও তাকে ত্যাগ করি নে। এই সাধনায় আমার যেন একটুও শৈথিল্য না হয়।" (পরিচ্ছেদ - ৩৩)

এই বোধ থেকেই মধুসূদনের ব্যবহারে আহত কুমুদিনী সংকটকালে শাস্ত্রচালিত বিশ্বাসের জগতে আশ্রয় নিয়ে ব্যক্তি মধুসূদনের দীনতা আইডিয়ার দ্বারা শোধন করতে চেয়েছে। যেমন - ৩৪ সংখ্যক পরিচ্ছেদে নিজের চিঠি লেফাফা খোলা অবস্থায় পাওয়ার পর এহেন অবমাননায় বিদ্রোহী মনকে কুমুদিনী শান্ত করতে চেয়েছে শাস্ত্রবচনের আশ্রয়ে - "কুমু

ঘরে ঢুকে ডেস্কের দেরাজ খুলে দেখলে তার চিঠি। তুলে নিয়ে দেখলে লেফাফা খোলা। বুকের ভিতরটা ফুলে উঠতে লাগল, একেবারে অসহ্য হয়ে উঠল। যে বাড়িতে কুমু মানুষ হয়েছে সেখানে এ-রকম অবমাননা কোনোমতেই কল্পনা পর্যন্ত করা যেত না। নিজের আবেগের এই তীব্র প্রবলতাতেই তাকে ধাক্কা মেরে সচেতন করে তুলল। সে বলে উঠল, 'প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢুম্' - তবু তুফান থামে না - তাই বার বার বললে।" ৩৭-সংখ্যক পরিচ্ছেদে মধুসূদনের নম্রতা-খর্বতা কুমুদিনীকে সংকুচিত করে তুললে কুমুদিনী তার দেবতাকে ডেকেছে - "মধুসূদন যখন ক্ষুদ্র হয়, কঠোর হয়, তখন সেটা কুমুদিনীর পক্ষে তেমন কঠিন নয়। কিন্তু আজ তার এই নম্রতা, এই তার নিজেকে খর্ব করা, এর সম্বন্ধে কুমুর যে কী উত্তর তা সে ভেবে পায় না। হৃদয়ের যে দান নিয়ে সে এসেছিল সে তো সব স্খলিত হয়ে পড়ে গেছে, আর তো তা ধুলো থেকে কুড়িয়ে নিয়ে কাজ চলবে না। আবার সে ঠাকুরকে ডাকতে লাগল, প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢুম্।"

'স্বামীকে মন-প্রাণ সমর্পণ করতে না পারাটা মহাপাপ, এ সম্বন্ধে কুমুর সন্দেহ নেই, তবু ওর এমন দশা কেন হল? মেয়েদের একটিমাত্র লক্ষ্য সতীসাবিত্রী হয়ে ওঠা'। সেই লক্ষ্য হতে ভ্রষ্ট হওয়ার পরম দুর্গতি থেকে নিজেকে যে প্রতিমুহূর্তে বাঁচাতে চেয়েছে কখনো শাস্ত্রের আশ্রয়ে, কখনো বা নিজের মায়ের জীবনের অনুবৃত্তির আশঙ্কায়, সেই কুমুদিনী পরিণতিতে মধুসূদনের গৃহ ত্যাগ করে দাদার আশ্রয়ে থেকেছে। কুমুদিনীর এই বিবর্তন *যোগাযোগ* উপন্যাসে অপূর্ব শিল্পসুষমায় মণ্ডিত। কুমুদিনীর লড়াই তাই কেবলমাত্র মধুসূদনের স্থূলতার সাথে নয়, বরং নিজের আজন্মলালিত সংস্কারের সাথে নবার্জিত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধের। লক্ষণীয় নিজের প্রাচীন মূল্যবোধের সাথে নবার্জিত ব্যক্তিত্ববোধের এই দ্বন্দ্বে কুমুদিনী প্রথমাবধিই প্রাচীন সাহিত্য থেকে তার প্রতিবাদী চেতনার রসদ সংগ্রহ করেছে। অর্থাৎ যে প্রাচীন সাহিত্য কুমুদিনীর মধ্যে পাতিব্রত্যের সংস্কার গড়ে তুলেছে, সেই একই সাহিত্য তার মধ্যে স্বাতন্ত্র্যের বীজও বপন করেছে। এ কারণেই ২৬ সংখ্যক পরিচ্ছেদে মোতির মা'র সাথে

কথোপকথনকালে কুমুদিনী রঘুবংশের দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছে।

"একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, আজ থেকে আমার নিজের বলে কিছুই রইল না?

না, রইল না। যা কিছু রইল তা স্বামীর মর্জির উপরে। জান না, চিঠিতে দাসী বলে দস্তখত করতে হবে?

দাসী! মনে পড়ল রঘুবংশের ইন্দুমতীর কথা -

গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ

প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ -

ফর্দের মধ্যে দাসী তো কোথাও নেই। সত্যবানের সাবিত্রী কি দাসী? কিংবা উত্তর রামচরিতের সীতা? কুমু বললে, স্ত্রী যাদের দাসী তারা কোন জাতের লোক?"

কুমুদিনী যখন যখন তার স্বাতন্ত্র্য ক্ষুণ্ণ হতে দেখেছে, ততবারই সে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। দাদার দেওয়া নীলার আংটি রাখা প্রসঙ্গে মধুসূদনের সাথে কথোপকথনসূত্রেও তার এই বিদ্রোহ ফুটে উঠেছে -

"তোমার জিনিস তুমি রাখতে পারবে, আর আমার জিনিস আমি রাখতে পারব না?

- এ বাড়ীতে তোমার স্বতন্ত্র জিনিস বলে কিছু নেই।

- কিছু নেই? তবে রইল তোমার এই ঘর পড়ে।" (পরিচ্ছেদ - ২৬)

কুমুদিনীর এই দাবি স্বামী-স্ত্রীর সমানাধিকারের দিকেই ইঙ্গিত করে। স্ত্রী কুমুদিনী এবং ব্যক্তি কুমুদিনী যে এক নয়, মধুসূদন স্বামীত্বের অধিকারে স্ত্রী কুমুদিনীকে পেলেও ব্যক্তি কুমুদিনী যে তার নাগালের বাইরেই রয়ে যাবে, মোতির মাকে বলা কুমুদিনীর উচ্চারণে তা স্পষ্ট - "নিজেকে দেব বলেই তৈরি হয়ে এসেছিলুম, কিন্তু ও কিছুতেই দিতে দিলে না। এখন দাসী নিয়েই থাকুক। আমাকে পাবে না।"

'চিরজীবন ধরে এমন সমুদ্রে কি তাকে সাঁতার কাটতে হবে যার কূল কোথাও নেই?' - এই প্রশ্নে কুমুদিনী ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে। আর পাঁচটা সাধারণ নারীর মতো এই অনন্বয়কে

প্রতিদিনের এই অবমাননাকে মেনে না নিয়ে কুমুদিনী চরম সিদ্ধান্ত নিয়েছে মধুসূদনের গৃহত্যাগ করা। কেননা কুমুদিনী তার ব্যক্তিত্ব বিসর্জন দিয়ে মধুসূদনের বাড়ির বড়োবউ হয়ে জীবন নির্বাহ করতে চায় নি। উপন্যাসের শেষে কুমুদিনী তার অবস্থানের দৃঢ়তা স্পষ্ট করে দিয়েছে যেখানে কোনো সংশয় বা সংস্কারের পিছুটানের লেশমাত্র থাকে নি। "মিথ্যে হয়ে মিথ্যের মধ্যে থাকতে পারব না। আমি ওদের বড়োবউ, তার কি কোনো মানে আছে যদি আমি কুমু না হই?" (পরিচ্ছেদ - ৫৭) আর এখানেই রবীন্দ্রনাথ একটা চরম প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলেন - দাম্পত্যনীতিতে নারীর স্ত্রীত্ব কি এতোটাই বড়ো, যা নারীব্যক্তিত্বকেও আচ্ছন্ন করতে পারে।

বিবাহ ও স্ত্রী সম্পর্কে সমাজমানসে বয়েচলা যে সংস্কার আজও বর্তমান, *যোগাযোগ* উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ যেন সেই বিশ্বাস বা সংস্কারকেই প্রশ্নবাণে বিদ্ধ করেছেন। কুমুদিনীর প্রতি সহানুভূতিশীল হয়েও মোতির মা এই সংস্কার থেকেই কুমুদিনীর বিদ্রোহকে সমর্থন করতে পারে নি। কুমুদিনীর অবমাননায় 'লতার একেবারে গোড়ায় ঘা লেগেছে, উপর থেকে অনুগ্রহের জল ঢেলে মালী আর একে তাজা করে তুলতে পারবে না' মতির মা এটা বুঝলেও 'ভালো না বাসলেও ভালো স্ত্রী হওয়া যায়, নইলে সংসার চলবে কী করে?' - এই বিশ্বাসও তার বদ্ধমূল ছিল। আর এই বিশ্বাস থেকেই কুমুদিনীর বিদ্রোহকে মোতির মা সমর্থন করা তো দূরের কথা বরং কুমুদিনীর প্রতি বিরূপতাই পোষণ করেছে - "মোতির মা একদিন কুমুর দুঃখে সব চেয়ে বেশি দুঃখ পেয়েছিল, বোধ করি সেইজন্যই আজ তার মন এত কঠিন হতে আরম্ভ করেছে। প্রতিকূল ভাগ্য যখন বরদান করতে আসে, তখন তার পায়ে মাথা ঠেকিয়ে যে মেয়ে অবিলম্বে সে বর গ্রহণ করতে না পারে, তাকে মমতা করা মোতির মা'র পক্ষে অসম্ভব - এমন কি, মার্জনা করাও।" (পরিচ্ছেদ - ৪৫) কিংবা "কুমুকে মোতির মা খুবই ভালোবাসে, ভক্তি করে, কিন্তু তবু কোনো মেয়ের এত মূল্য থাকতে পারে যে তার গৌরব স্বামীকে ছাপিয়ে যাবে এ কথা মোতির মা'র কানে ঠিক লাগল না। সংসারে স্বামীর সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি চলুক, স্ত্রীর ভাগ্যে অনাদর-অপমানও না-হয় যথেষ্ট ঘটল, এমন কি, তার থেকে

নিষ্কৃতি পাবার জন্যে স্ত্রী আফিম খেয়ে গলায় দড়ি দিয়ে মরে সেও বোঝা যায়, কিন্তু তাই বলে স্বামীকে একেবারে বাদ দিয়ে স্ত্রী নিজের জোরে থাকবে এটাকে মোতির মা স্পর্ধা বলেই মনে করে। মেয়েজাতের এত গুমর কেন? মধুসূদন যত অযোগ্য হোক যত অন্যায় করুক, তবু সে তো পুরুষ মানুষ; এক জায়গায় সে তার স্ত্রীর চেয়ে আপনিই বড়ো, সেখানে কোনো বিচার খাটে না। বিধাতার সঙ্গে মামলা করে জিতবে কে?" (পরিচ্ছেদ - ৫১)

এর বিপরীতে কুমুদিনী ও বিপ্রদাসের স্থিতি। মোতির মা'র যুক্তি বিপ্রদাসের কাছে তাই অকাট্য নয়। এ প্রসঙ্গে মোতির মা ও বিপ্রদাসের কথোপকথন উল্লেখযোগ্য -

"কিন্তু আপন সংসার না থাকলে মেয়েরা যে বাঁচে না; পুরুষেরা ভেসে বেড়াতে পারে, মেয়েদের কোথাও স্থিতি চাই তো।"

"স্থিতি কোথায়? অসম্মানের মধ্যে?"

কুমুর অসম্মানে বিপ্রদাস সমগ্র নারীসমাজের অপমান প্রত্যক্ষ করেছে। সমাজসৃষ্ট সতীত্বের জাতাকলে অনবরত ঘটে চলা নারীব্যক্তিত্বের নিষ্পেষণ লক্ষ্য করে বিপ্রদাসের উচ্চারণ নারীচেতনাবাদী পাঠে মনোযোগের কেন্দ্রে চলে আসে। এই উচ্চারণের পেছনে ঔপন্যাসিকের কণ্ঠস্বর অপ্রত্যক্ষ থাকে না।

ক. "আমি দেখতে পাচ্ছি, মেয়েদের যে অপমান, সে আছে সমস্ত সমাজের ভিতরে, সে কোনো একজন মেয়ের নয়।"

খ. "সহ্য করা ছাড়া মেয়েদের অন্য কোনো রাস্তা একেবারেই নেই বলেই তাদের উপর কেবলই মার এসে পড়ছে। বলবার দিন এসেছে যে সহ্য করব না।"

গ. "স্ত্রীকে নিরুপায়ভাবে স্বামীর বাধ্য করতে সমাজে হাজার রকম যন্ত্র ও যন্ত্রণার সৃষ্টি করা হয়েছে, অথচ সেই শক্তিহীন স্ত্রীকে স্বামীর উপদ্রব থেকে বাঁচাবার জন্যে কোনো আবশ্যিক পন্থা রাখা হয় নি। এরই নিদারুণ দুঃখ ও অসম্মান ঘরে ঘরে যুগে যুগে কী রকম ব্যাপ্ত হয়ে আছে এক মুহূর্তে বিপ্রদাস তা যেন দেখতে পেলে। সতীত্বগরিমার ঘন প্রলেপ দিয়ে এই ব্যথা

মারবার চেষ্টা, কিন্তু বেদনাকে অসম্ভব করবার একটুও চেষ্টা নেই। স্ত্রীলোক এত সস্তা, এত অকিঞ্চিৎকর।'' (পরিচ্ছেদ - ৫০)

যে সমাজের নারীর প্রতি কোনো ভালোবাসা নেই, 'আছে কেবল বিধান', সেই সমাজকেই কাঠগড়ায় তুলে বিপ্রদাস যখন বলে - 'যে সমাজ নারীকে তার মূল্য দিতে এত বেশি ফাঁকি দিয়েছে তার সঙ্গে লড়াই', এবং কুমুকে 'ব্যক্তিগতভাবে নিজের কথা ভুলে সেই অসম্মানের বিরুদ্ধে' দাঁড়াতে বলে, তখন সমস্ত বর্গনারীর (women, as a category) হয়ে ঔপন্যাসিকের সহমর্মিতা চাপা থাকে না। কুমুদিনীর প্রতি মধুসূদনের ব্যবহার যে নারীর প্রতি সামাজিক অবমাননার পুরাতন ধারারই অনুবর্তন, বিপ্রদাসের জবানিতে ঔপন্যাসিক এই সত্যটিই তুলে ধরেছেন। মুকুন্দলাল ও মধুসূদন দুজন দুটি যুগের প্রতিনিধিত্ব করলেও এদিক থেকে সমগোত্রীয়। সামন্ততন্ত্রের প্রতিভূ মুকুন্দলাল ও ধনতন্ত্রের প্রতিনিধি মধুসূদন কারো কাছেই নারীর স্বতন্ত্র কোনো মর্যাদা ছিল না। স্ত্রীর উপস্থিতিতেই মুকুন্দলাল বড়োমানুষির আভিজাত্যে 'একাদশ অপকর্মে' লিপ্ত হয়েছে। এ কারণেই বিপ্রদাস যখন বলে - ''আমার মা যে অপমান পেয়েছিলেন তাতে সমস্ত স্ত্রীজাতির অসম্মান। কুমু, তুই ব্যক্তিগতভাবে নিজের কথা ভুলে সেই অসম্মানের বিরুদ্ধে দাঁড়াবি, কিছুতে হার মানবিনে।'' (পরিচ্ছেদ - ৫০) - তা নারীর প্রতি আবহমান কাল থেকে চলতে থাকা নিরবচ্ছিন্ন অবমাননার ঐতিহাসিক সত্যের দিকেই ইঙ্গিত করে। 'মুকুন্দলাল ও তাহার স্ত্রীর ট্র্যাজিক-সম্বন্ধ স্বয়ং সম্পূর্ণ একটি গল্প; সেই গল্পটি এই দীর্ঘায়ত ভূমিকায় ঢুকিয়া পড়ায় উপন্যাসের পক্ষে তা অপ্রাসঙ্গিক এবং গল্পবস্তুর আয়তনের তুলনায় অতি মাত্রায় প্রলম্বিত' এবং 'কুমুদিনী মধুসূদনের ঘর ছাড়িয়া পিতৃগৃহে চলিয়া আসিবার পর সুদীর্ঘ পৃষ্ঠা জুড়িয়া স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ, স্ত্রীর অধিকার লইয়া যে তর্কজাল বিস্তৃত হইয়াছে তাহাও গল্পবস্তুর দিক হইতে কতকটা অবান্তর'[৬] বলে সমালোচকের মনে হলেও আমাদের পাঠে সমালোচক চিহ্নিত এই দুটি দিকই উপন্যাসের পক্ষে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও প্রয়োজনীয়।

আজকের দিনেও আমাদের সমাজ-মনে বদ্ধমূল যে বিবাহ ও দাম্পত্যসংস্কার, তার মূল ধরেই যেন নাড়া দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ *যোগাযোগ* উপন্যাসে। উপন্যাসটির পুনঃপাঠ-এমন প্রতীতিই জাগায়। মধুসূদন সহবাসে কুমুর প্রচণ্ড অসম্মতি লক্ষ্য করে পজিটিভিস্ট বিপ্রদাস যে কথাগুলি বলেছে এবং যে অবস্থান গ্রহণ করেছে, তাতে অগস্ত কোঁতের বিবাহনীতির প্রভাব থাকা অসম্ভব নয়। কোঁত Civil, Religious এবং Chaste - যে ত্রিবিধ বিবাহের ধারণা দিয়েছেন, তাতে Civil বিবাহ মতে দম্পতির বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করার অধিকার থাকে। অথচ সমাজ তখন তো বটেই এখনও স্ত্রীর বিবাহবিচ্ছেদ মন থেকে মেনে নিতে পারে নি। নারী সম্পর্কে প্রাগ্রসর চিন্তাধারা বিপ্রদাসের সাথে সমাজের অনন্বয়ের ক্ষেত্রকেই প্রসারিত করেছে। পিতৃতান্ত্রিক সমাজের বিরুদ্ধে একক লড়াইয়ে পরিণামে বিপ্রদাস হয়েছে আত্মদংশনে ক্ষতবিক্ষত। একারণেই মধুসূদনের কাছ থেকে আইনি চিঠি পাওয়ার পর আইনত বিপ্রদাসের কিছুই করার থাকে না।

সময়ের দিক থেকে *যোগাযোগ* উপন্যাসের ঘটনাকাল থেকে আজকের দূরত্ব প্রায় দেড়শ বছর। এই দেড় শতকে পাল্টেছে অনেক কিছু। নারীর স্বপক্ষে তৈরি হয়েছে একাধিক আইন। কুমুদিনী শ্বশুরবাড়ি যেতে অস্বীকৃত হলে মধুসূদন আইনি পথ অবলম্বনের কথা জানিয়েছে - 'জান পুলিস ডেকে তোমাকে নিয়ে যেতে পারি ঘাড়ে ধরে? না বললেই হল।' (পরিচ্ছেদ - ৫৫) আজকের মধুসূদনের পক্ষে এহেন আস্স্কালন অন্ততঃ সম্ভব নয়। তবু আজও যে দাম্পত্যের বন্ধনে সতীত্বের আদর্শ মাথায় করে অসংখ্য নারী লাঞ্ছিত হয়ে চলেছে, তা আমাদের প্রতিদিনের অভিজ্ঞতায় স্পষ্ট। এই প্রেক্ষিতে কুমুদিনী প্রতিস্পর্ধী উচ্চারণ। ১৩৩২ সনে ভারতবর্ষীয় বিবাহ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, "... স্বামী তার পক্ষে আইডিয়া। ব্যক্তির কাছে পাশব বলে সে নত হয় না, আইডিয়ার কাছে ধর্মবলে সে আত্মসমর্পণ করে।" - এই সংস্কার সমাজ-মানসে আজও গভীরভাবে ক্রিয়াশীল থাকায় দাম্পত্যের উচ্চ আদর্শের দোহাই দিয়ে অনবরত নারীত্বের নিষ্পেষণ চললেও আইনি রক্ষাকবচ সহস্রযোজন দূরেই

থেকে যায়। ভারতীয় সমাজে আইন-প্রণয়নের মধ্য দিয়ে কাঙ্খিত ফল-লাভ যে সম্ভব নয়, তা ১২৯৪ - এ লেখা হিন্দুবিবাহ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট জানিয়েছেন -

> "স্ত্রী অসতী হইলে আমরা ইচ্ছামত তাহাকে ত্যাগ করিয়া যত ইচ্ছা বিবাহ করিতে পারি। স্বামী ব্যভিচারপরায়ণ হইলেও স্বামীকে ত্যাগ করা স্ত্রীর পক্ষে নিষিদ্ধ। স্বামী যখন প্রকাশ্যভাবে অন্য স্ত্রী অথবা বারস্ত্রীতে আসক্ত হইয়া পবিত্র একীকরণের মস্তকের উপর পঙ্কিল পাদুকাসমেত দুই চরণ উত্থাপন করেন তখন অরণ্যে রোদন ছাড়া স্ত্রীর আর কোনো অধিকার দেওয়া হয় নাই।
>
> ... রাজবিধির সহায়তা লইয়া সমাজ সংস্কার আমার মত নহে। জীবনের সকল কাজই যে লাল-পাগড়ির ভয়ে করিতে হইবে, আমাদের জন্য সর্বদাই যে একটা বড়ো দেখিয়া বিজাতীয় জুজু পুষিয়া রাখিতে হইবে, আপন মঙ্গল-অমঙ্গল কোনোকালেই আপনারা বুঝিয়া স্থির করিতে পারিব না, ইহা হইতেই পারে না; জুজুর হস্তে সমাজ সমর্পণ করিলে সমাজের আর উদ্ধার হইবে কবে।"[৭]

সেদিন রবীন্দ্রনাথের এই উপলব্ধি কতটা অভ্রান্ত ছিল, আজও সমাজের সর্বস্তরে আকছার ঘটেচলা নারীত্বের অবমাননা তার প্রমাণ। অথচ এই সময়পর্বে নারীর স্বপক্ষে তৈরি হয়েছে বহুবিধ আইন ও পরিকল্পনা। Age of Consent Act-1891, বিশ শতকের পাঁচ থেকে ছয়ের দশকের মধ্যে তৈরি হওয়া বিবাহ আইন, পণপ্রথা বিরোধী আইন, গর্ভপাত আইনসম্মত হয়েছে ১৯৭১ সালে, সতীপ্রথা রোধ করতে কমিশন বসানোর আইন এসেছে ১৯৮৭ তে, ১৯৮৯ সালে দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্পে সুযোগ-সুবিধার ৪০ শতাংশ নারীর জন্য সংরক্ষণের আইন এসেছে, ১৯৯২ সালে রাজনীতিতে মেয়েদের জন্য ত্রিশ শতাংশ আসন সংরক্ষিত হয়েছে, যা পরবর্তীতে তিন শতাংশ আরও বেড়েছে, যৌন অপমান ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে আইন হয়েছে ১৯৯৮ সালে, ২০০৫ সালে এসেছে গার্হস্থ্য আইন (Protection of women from domestic violence Act-2005) রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে

নারীর অংশগ্রহণ দিন দিন বেড়েছে। শিক্ষার ক্ষেত্রেও নারীশিক্ষার হার ঊর্ধমুখী।[৮] এরই পাশাপাশি নারীর প্রতি ঘটেচলা অত্যাচারের হারও ঊর্ধমুখী।[৯] এখনও ভারতে ৪৭ শতাংশ নারীর বিবাহ হয় ১৮ বছরের কম বয়সে।[১০] ২০১১-র জনগণনা অনুযায়ী প্রতি ১০০০ পুরুষের বিপরীতে নারীর অনুপাত ৯৪০ জন। ছয় বছর বয়সী শিশুদের মধ্যে নারীর অনুপাত আরও কম, ৯১৪ জন।[১১]

নারীসম্পর্কে সামন্ততান্ত্রিক ধারণা এবং দাম্পত্য সম্পর্কে সমাজমানসে দৃঢ়প্রোথিত পিতৃতান্ত্রিক মূল্যবোধ যে এর জন্য দায়ি, তা অস্বীকার করা যায় না। লক্ষণীয় কুমুদিনীও দাম্পত্য সম্পর্কে এহেন শাস্ত্রশাসিত মানসিকতা নিয়েই দাম্পত্যজীবনে প্রবেশ করেছে। এদিক থেকে কুমুদিনী সংস্কারশাসিত পীড়িত নারীসমাজের প্রতিনিধি যেন। এ-কারণেই কুমুদিনী যখন বিপ্রদাসকে বলে - "তুমি যাকে মুক্তি বল, যা জ্ঞানের দ্বারা হয়, আমাদের রক্তের মধ্যে তার বাধা। আমরা মানুষকেও জড়িয়ে থাকি, বিশ্বাসকেও; কিছুতেই তার জট ছাড়াতে পারি নে। যতই ঘা খাই ঘুরে ফিরে আটকা পড়ি। তোমরা অনেক জান তাতেই তোমাদের মন ছাড়া পায়, আমরা অনেক মানি তাতেই আমাদের জীবনের শূন্য ভরে। তুমি যখন বুঝিয়ে দাও তখন বুঝতে পারি হয়তো আমার ভুল আছে। কিন্তু ভুল বুঝতে পারা, আর ভুল ছাড়তে পারা কি একই? লতার আঁকড়ির মতো আমাদের মমত্ব সব কিছুকেই জড়িয়ে জড়িয়ে ধরে, সেটা ভালোই হোক আর মন্দই হোক, তার পরে আর তাকে ছাড়তে পারি নে।"(পরিচ্ছেদ - ৫১) তখন 'আমাদের' সর্বনামের ব্যবহারের মধ্য দিয়ে সংস্কারশাসিত নিষ্পেষিত সমগ্র নারীসমাজ উঠে আসে যেন। কুমুদিনীও এদেরই একজন।কিন্তু তার আজন্মলালিত সংস্কারের মধ্যেই কুমুদিনী বন্দী থাকে নি, 'অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো'র মতোই তার ব্যক্তিত্ববোধের স্ফুরণ তাকে তার আইডিয়ার জগৎ থেকে বের করে এনেছে। কুমুদিনীর আলো-আঁধারী জীবনপ্যাটার্ন সমালোচিত হলেও এই উত্তরণ নারীচেতনাবাদী পাঠে মনোযোগের কেন্দ্রে চলে আসে।

২৩ সংখ্যক পরিচ্ছেদে মোতির মা'র মনে কুমু ও মধুসূদনের দাম্পত্য অসংগতি আশঙ্কায় যে বিভীষিকার ছবি জেগেছে - "যেখানে একটা অজানা জন্তু লালায়িত রসনা মেলে গুঁড়ি মেরে বসে আছে, সেই অন্ধকার গুহার মুখে কুমুদিনী দাঁড়িয়ে দেবতাকে ডাকছে।" - দাম্পত্যের বন্ধনে কুমুর অসহায়তা বোঝাতে এই একই বিভীষিকাময় অনুষঙ্গ গোত্রান্তরিত হয়েছে বাজপাখি, ক্ষুধিত জরা, অজগর প্রভৃতি ইমেজে -

ক. "আকাশ থেকে বাজপাখির ছায়া দেখতে পেয়ে কপোতীর যেমন করে, কুমুর বুকটা তেমনি কাঁপতে লাগল।" (পরিচ্ছেদ - ২৪)

খ. "একটা কালো কঠোর ক্ষুধিত জরা বাহির থেকে কুমুকে গ্রাস করেছে রাহুর মতো।"(পরিচ্ছেদ - ৩৮)

গ. " আজ এই ছায়াম্লান আর্দ্র একঘেয়ে দিনে কুমুর মনে হল, তার নিজের জীবনটা তাকে যেন অজগরের মতো গিলে ফেলেছে, তারই ক্লেদাক্ত জঠরের রুদ্ধতার মধ্যে কোথাও একটুমাত্র ফাঁক নেই।"(পরিচ্ছেদ - ৪২)

এই ক্লেদাক্ত বিভীষিকাময় দাম্পত্য থেকে কুমুদিনীর নিষ্ক্রমণ *যোগাযোগ* উপন্যাসের মৌল আধের হওয়ায় কুমুদিনী আজকের নারীচেতনাবাদী পাঠে নবরূপে উদ্ভাসিত হয়ে উঠতে পারে।

Protection of women from domestic violence Act-2005 অনুযায়ী বিবাহিতা স্ত্রীর সম্মতিভিন্ন দৈহিক সহবাস যখন ধর্ষণ হিসেবে গণ্য, তখন ১৯২৯-এ প্রকাশিতে *যোগাযোগ* উপন্যাসে এই বিষয়টিই ভিন্ন ভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। স্বামীর কাছে শ্রদ্ধাহীন আত্মসমর্পণ, মনহীন দেহের নৈবেদ্য কুমুর কাছে 'আন্তরিক অসতীত্ব' মনে হয়েছে। অনিচ্ছিত শারীরিক সম্পর্কের গ্লানি কুমুকে কতখানি বিপর্যস্ত করেছিল, তা বোঝা যায় অপ্রস্তুত মন নিয়ে স্বামী সহবাসের পর কুমুর মানসিক প্রতিক্রিয়ায় - "যে আহ্বানকে সে দৈব বলে মেনেছিল, সে কি এই অশুচিতার মধ্যে, এই আন্তরিক অসতীত্বে? ঠাকুর নারীবলি চান

বলেই শিকার ভুলিয়ে এনেছেন নাকি; যে শরীরটার মধ্যে মন নেই সেই মাংসপিণ্ডকে করবেন তাঁর নৈবেদ্য? আজ কিছুতে ভক্তি জাগল না। এতদিন কুমু বার বার করে বলেছে, আমাকে তুমি সহ্য করো - আজ বিদ্রোহিণীর মন বলছে, তোমাকে আমি সহ্য করব কী করে? কোন লজ্জায় আনব তোমার পূজা? তোমার ভক্তকে নিজে না গ্রহণ করে তাকে বিক্রি করে দিলে কোন্ দাসীর হাটে - যে হাটে মাছমাংসের দরে মেয়ে বিক্রি হয়, যেখানে নির্মাল্য নেবার জন্যে কেউ শ্রদ্ধার সঙ্গে পূজার অপেক্ষা করে না, ছাগলকে দিয়ে ফুলের বন মুড়িয়ে খাইয়ে দেয়।'' (পরিচ্ছেদ - ৩৮) - এ-কারণেই সহবাসের পরদিন সকালে কুমু ঠাকুরের নৈবেদ্য সাজায় নি, যেহেতু মনহীন সহবাসে মনও অশুচি হয়েছে তার।

প্রতিদিনের অবমাননা, 'আন্তরিক অসতীত্বের' গ্লানি থেকে বাঁচতে কুমুদিনী দাদা বিপ্রদাসের আশ্রয় গ্রহণ করে সে যে আর মধুপ্রাসাদে প্রত্যাবর্তন করবে না তা জানিয়ে দিলেও বিপ্রদাসের আশ্রয়ে সে তার স্বাভাবিক স্থানটি খুঁজে পায় নি। অবশেষে সন্তানসম্ভাবনা বিপন্ন করে কুমুকে, 'জব্দ' হয়ে কুমুদিনী বাধ্য হয় 'মধুপ্রাসাদে' প্রত্যাবর্তন করতে। তবে এই প্রত্যাবর্তন মধুসূদনের ইচ্ছার কাছে তার আত্মসমর্প নয়। কুমু যে পুনরায় তার দাদার আশ্রয়ে ফিরে আসবে তার স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে বিপ্রদাসের কাছে তার অঙ্গীকারে - ''একদিন ওদেরকে মুক্তি দেব, আমিও মুক্তি নেব; চলে আসবই এ তুমি দেখে নিয়ো। মিথ্যে হয়ে মিথ্যের মধ্যে থাকতে পারব না। আমি ওদের বড়োবউ, তার কি কোনো মানে আছে যদি আমি কুমু না হই।''

আর এখানেই কুমুদিনী আজকের নারীচেতনাবাদীর কাছে প্রেরণার আদি উৎস রূপে গৃহীত হতে পারে। কিন্তু কিভাবে, সেটা বোঝার জন্য একটি বাস্তব ঘটনার দিকে তাকানো যেতে পারে। ঘটনাটি রুশতী সেন যেমন লিখেছেন হুবহু তা উল্লেখ করা গেল -

''বাঙালি মেয়ে। পেশায় সে বিমানসেবিকা। নিজের উপার্জনে সে মা আর

ছোটবোনদের সংসার চালায়। মেয়েটি বিয়ে করল নিজের পছন্দে। স্বামী ডাক্তার। দুর্ভাগ্য তাদের, ছেলেটি আজন্ম প্রতিবন্ধী। ক্রমে মেয়েটি বোঝে যে তার স্বামী তাকে অতিরিক্ত ঘুমের ওষুধ খাইয়ে স্বাভাবিক জীবন যাত্রার বাইরে নিয়ে যাচ্ছে। তারপর অল্পবিস্তর মারধোর। আর তার সকলের ছোট বোনটির সঙ্গে তারই চোখের সামনে স্বামীর প্রণয়। মেয়েটি নারী সংগঠনের সাহায্য চায়। 'সচেতনা' মারধোরের ঘটনা থানাকে জানায়। থানা FIR নেয়। এরপর ডাক্তারস্বামী তার স্ত্রীকে কলকাতার একটি বিখ্যাত নার্সিংহোমের ইনটেন্‌সিভ কেয়ার ইউনিটে ভর্তি করে দেয়। সচেতনার সদস্যরা সেখানেও মেয়েটির সঙ্গে দেখা করেন। কিন্তু বাড়িতে ফিরে মেয়েটি বলে, স্বামীর সঙ্গে তার ভুল বোঝাবুঝির মূলে ঐ নারী সংগঠনের সদস্যরা। সুতরাং এরপরে সচেতনা মেয়েটির সঙ্গে নিজেদের সংস্রব ছিন্ন করে। মেয়েটির বক্তব্য হলো যে, সে একা থাকতে পারবে না। জীবনে সে কম লড়াই করেনি। উপরন্তু তার ছেলেটাও প্রতিবন্ধী। স্বামী তাকে যেভাবে রাখবে, সেভাবেই সে থাকতে রাজি। এবং তাই সে ছিল। স্বামীর সাথে ছোটবোনের প্রণয় মেনেনিয়ে, স্বামীর ঘরেই সে থাকল-একটি কামরার গণ্ডিতে।"[১২]

- এই ঘটনাটির সময়কাল বিশ শতকের আটের দশক। এই মেয়েটি অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী, বিবাহবিচ্ছেদ এবং খরপোশ দুটিই তখন আইনসিদ্ধ - যার কোনোটাই কুমুদিনীর ক্ষেত্রে ছিল না। কুমুদিনীর কালপর্বের সাথে এই ঘটনাটির সময়গত ব্যবধান প্রায় এক শতকেরও সামান্য বেশি। কুমুদিনীর ঘটনা সামন্ততন্ত্র ও ধনতন্ত্রের যুগসন্ধিক্ষণের, অপরদিকে উক্ত ঘটনাটি ধনতন্ত্র থেকে উন্নত ধনতন্ত্রের সন্ধিক্ষণের। অথচ দুটো ঘটনারই পরিণতিতে কি আশ্চর্যজনক অমিল। এই মেয়েটি সব রকম অবমাননা সহ্য করে রয়ে গেল স্বামীগৃহে 'একটি কামরার গণ্ডিতে', অপরদিকে কুমুদিনী কোনোরকম আইনি সুরক্ষা ও অর্থনৈতিক স্বাবলম্বন ছাড়াই জানালো সে ভবিষ্যতে স্বামী-গৃহ ত্যাগ করবে, কেননা কুমুদিনী উপলব্ধি

করেছিল 'এমন কিছু আছে যা ছেলের জন্যেও খোওয়ানো যায় না'। নারীচেতনাবাদী পাঠে তাই নবভাবে আবিষ্কৃত হতে পারে কুমুদিনী।

- ২ -

৭.২. ঔপনিবেশিক প্রেক্ষিত ও মধুসূদন ঃ পুনঃপাঠের আলোকে -

মহাকাব্যিক সম্ভাবনাপূর্ণ *যোগাযোগ* উপন্যাসটি পূর্ববর্তী *গোরা* উপন্যাসের মতো কোনো ধর্মীয়সংঘাত বা *ঘরে বাইরের* মতো রাষ্ট্রনৈতিক আলোড়নের প্রেক্ষাপটে রচিত হয়নি। বরং যোগাযোগের প্রেক্ষাপট রচনা করেছে বাংলার আর্থ-সামাজিক ইতিহাসের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়, যখন ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্রের ভগ্নস্তুপ থেকে জন্ম নিচ্ছে ঔপনিবেশিক ধনতন্ত্র এবং ভারতবর্ষ যখন 'পুঁজিবাদী অর্থনীতির পৃথিবীব্যাপী যন্ত্রের একটা অংশে পরিণত হচ্ছিল'।[১৩] 'এ উপন্যাসের মানুষেরা সেই যুগের যেখান থেকে প্রাচীন কাল সরতে আরম্ভ করেছে, কিন্তু নবীনযুগের আসন এখনো পাতা হয় নি'।[১৪] *যোগাযোগ* উপন্যাসের পরতে পরতে বিন্যস্ত হয়ে আছে এই দুটি যুগের যোগ ও অযোগের বিচিত্র ছবি। যে ছবি শুরু হয়েছে উপন্যাসের সূচনা থেকেই। নতুন যুগের বণিক মধুসূদন বিত্তের বৈভবে বর ও বরযাত্রীদের থাকার জন্য স্থান নির্বাচন করেছে চাটুজ্জেদের জমিদারীর অন্তর্গত ঘোষালদিঘি। যে ঘোষালদিঘি সম্পর্কে উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদে জানা যায়, ''ঘোষালদের ঐতিহাসিক যুগের শুরুতেই দেখি, প্রচুর ওদের জমিজমা, গোরুবাছুর, জনমজুর, পালাপার্বণ, আদায়বিদায়। আজও তাদের সাবেক গ্রাম শেয়াকুলিতে অন্তত বিঘে দশেক আয়তনের ঘোষালদিঘি পানা-অবগুণ্ঠনের ভিতর থেকে পঙ্করুদ্ধকণ্ঠে অতীত গৌরবের সাক্ষ্য দিচ্ছে। আজ সে দিঘিতে শুধু নামটাই ওদের, জলটা চাটুজ্যে জমিদারের।'' 'পানা-অবগুণ্ঠনের ভিতর থেকে পঙ্করুদ্ধকণ্ঠে' মধুসূদনের পূর্বপুরুষের 'অতীত গৌরবের সাক্ষ্য' বহনকারী এই ঘোষালদিঘিকেই নতুন রাজাবাহাদুর মধুসূদন কাঞ্চনকৌলীন্যে এমনভাবে সজ্জিত করেছে যাতে 'পঙ্করুদ্ধ' ঘোষালঐতিহ্য মধুসূদনের হাত ধরে নতুন সময়ে সদম্ভ আত্মপ্রচার করেছে - ''দিঘির পানা সব তোলা

হয়েছে। ঘাটের কাছে তকতকে নতুন বিলিতি পাল-খেলাবার দুটি নৌকো, তাদের একটির গায়ে লেখা 'মধুমতি', আর-একটির গায়ে 'মধুকরী'। যে তাঁবুতে রাজাবাহাদুর স্বয়ং থাকবেন তার সামনে ফ্রেমে হলদে বনাতের উপর লাল রেশমে বোনা 'মধুচক্র'। ... প্রবেশপথে কারুকাজ করা লোহার গেট, উপরে নিশান উড়ছে - নিশানে লেখা 'মধুপুরী'। চারি দিকেই 'মধু' নামের ছাপ।'' নতুন অর্থনীতির সুফলভোগী মধুসূদনের চাপরাসির দল 'বিলিতি জুতো মস্‌মসিয়ে' যখন 'চামড়ার কোমরবন্ধে ঝোলানো বিলিতি তলোয়ারটা' দিয়ে 'জমিদারের মাটিকে পায়ে পায়ে খোঁচা দিতে থাকে' এবং 'চাটুজ্জেদের সাবেক কালের জীর্ণসাজপরা বরকন্দাজেরা লজ্জায় ঘর হতে বার হতে চায় না' তখন সামন্ততন্ত্রের ভগ্নস্তুপের উপর ধনতন্ত্রের জয়পতাকা যে উড়ছে, সেই সামাজিক ও অর্থনৈতিক পটপরিবর্তনের কথাই জানায়। এর পর ঔপন্যাসিকের সংক্ষিপ্ত মন্তব্য, 'শুভপরিণয়ের এই সূচনা,' ব্যজস্তুতি অলঙ্কারের এই প্রয়োগ দুই আর্থ-সামাজিক পরিবেশ-পুষ্ট জায়া ও পতির দাম্পত্য সম্পর্ক যে বিপজ্জনক পরিণতি পেতে চলেছে তার দিকেই আগাম ইঙ্গিত দেয়।

নতুন যুগের প্রতিনিধি মধুসূদনকে ঔপন্যাসিক যত বিকৃত ভাবেই উপস্থাপিত করুন না কেন, আজকের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটের নিরিখে যোগাযোগের পুনঃপাঠ মধুসূদনকে মনোযোগের কেন্দ্রে নিয়ে আসে।

সামন্তসমাজ থেকে ধনবাদী সমাজে প্রবেশের প্রথম স্তর হল মূলধন সঞ্চয়। উনিশ শতকে বাঙালি বণিকশ্রেণীকে সেই মূলধন সঞ্চয় করতে হয়েছে। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন, 'তখন নিমক মহলের দেওয়ানী লইলেই লোকে দুই দিনে ধনী হইয়া উঠিত। এই রূপে সহরের অনেক বিখ্যাত ব্যক্তি ধনী হইয়াছেন।'[১৫] *নববাবুবিলাস* থেকে জানাযায় -

''ধন্য ধন্য ধার্ম্মিক ধর্ম্মাবতার ধর্ম্মপ্রবর্তক দুষ্ট নিবারক সৎ প্রজাপালক সদ্বিবেচক ইংরাজ কোম্পানি বাহাদুর অধিক ধনী হওনের অনেক পন্থা করিয়াছেন এই কলিকাতা

নামক মহানগর আধুনিক কাল্পনিক বাবুদিগের পিতা কিম্বা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আসিয়া ... বেতনোপভুক হইয়া কিম্বা রাজের সাজের কাঠের খাটের ঘাটের মাঠের ইটের সরদারি চৌকিদারী জুয়াচুরি পোস্করী করিয়া অথবা ... কোম্পানির কাগজ কিম্বা জমিদারি ক্রয়াধীন বহুতর দিবসাবসানে অধিকতর ধনাঢ্য হইয়াছেন ... ।"[১৬]

১৮০৫ - ০৬ সালের কলকাতার 'বার্ষিক ডিরেক্টরী ও অ্যালম্যানাকে' অন্তত ১২ জন এদেশীয় বণিক দালাল ও শ্রফের নাম পাওয়া যায়।[১৭] ১৮৫৮ সালে বাঙালি পরিচালিত যে কয়েকটি বড় বড় বাণিজ্যপ্রতিষ্ঠান ছিল, তার মধ্যে ৯ টি বড় বাণিজ্যপ্রতিষ্ঠানের উল্লেখ পাওয়া যায় *বাংলার নবজাগৃতি* গ্রন্থে - "আশুতোষ দে এণ্ড কোং, চ্যাটার্জি মিত্র এণ্ড কোং, দে মুখার্জি এণ্ড কোং, রামগোপাল ঘোষ এণ্ড কোং, দত্ত লিনজি এণ্ড কোং, মোহনচাঁদ দত্ত এণ্ড কোং, মতিলাল মল্লিক এণ্ড কোং, প্রেমচাঁদ ফিলস্ এণ্ড কোং, রাধানাথ দত্ত এণ্ড কোং।" এছাড়াও প্রায় ৬৫ জন বেনিয়ানের নাম পাওয়া যায়।[১৮] মধুসূদন এদেরই একজন।

উনিশ শতকে বাঙালি বণিকশ্রেণীর হাতে যথেষ্ট মূলধন থাকলেও তা যে স্বাধীন শিল্পের ক্ষেত্রে নিয়োজিত হল না, তার পেছনে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির ষড়যন্ত্র ক্রিয়াশীল থাকলেও সেটাই একমাত্র কারণ ছিল না। বরং তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যও শিল্পোদ্যোগীসুলভ ছিল না।

"যদি একথা সত্য হয় যে - Enterprise is action of relatively high order of vigor, inspired by the vision of achievement of some desirable and ambitious objective ... তাহলে একথাও মনে হয় যে অর্থনীতিক্ষেত্রে ধনিক ও মধ্যবিত্ত বাঙালীদের কোন ambitious objective এর vision of achievement ছিল না এবং তার দ্বারা অনুপ্রাণিত এমন কোন কর্মে তাঁরা প্রবৃত্ত হন নি যাতে high order of vigor প্রয়োজন হয়। দ্বারকানাথ ঠাকুর ও রামদুলাল দে'র মতো দু'একজন যাঁরা স্বাধীন শিল্পবাণিজ্যকর্মে

> প্রবৃত্ত হয়েছিলেন তাঁদের action ও vision দুই-ই অনেকটা ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের প্রতিবন্ধকতায় নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। দ্বারকানাথের মতো কেউ কেউ অধিক ব্যয় ও অতিবিলাসে অনেক মূলধন ক্ষয় করেছিলেন, জমিদারীর নিশ্চিন্ত আয়ের প্রতি প্রলুব্ধ হয়েছিলেন, আবার কেউ কেউ রামদুলালের মতো যথেষ্ট বণিক-বুদ্ধি থাকা সত্ত্বেও সামাজিক রীতিনীতি ও প্রথার পাদমূলে অনেক মূলধন উৎসর্গ করেছিলেন।[১৯]

নবম পরিচ্ছেদে জানা যায়, 'ভূষণ রায় মস্ত মহাজন, বিশ-পঁচিশ লাখ টাকার তেজারতি'। এই ভূষণ রায় করিমহাটি তালুক বিপ্রদাসের কাছ থেকে পত্তনি নিতে চেয়েছে। বাংলার আর্থ-সামাজিক ইতিহাসের একটা প্রবণতা যেন ভূষণ রায়ের তালুক পত্তনি নেবার সংবাদে প্রকাশিত হয়েছে। বিশ-পঁচিশ লাখ টাকা নেহাত কম নয়, যে টাকা দিয়ে ভূষণ রায় অনায়াসেই স্বাধীন বাণিজ্য করতে পারত, সেটা না করে সে চেয়েছে তালুক পত্তনি নেবার মধ্যদিয়ে অলস পুঁজির বিনিয়োগ। আমরা মধুসূদনের কৃতিত্ব বুঝে নিতে চাই বাংলার সমাজেতিহাসের এই প্রবণতার নিরিখে।

এদিক থেকে মধুসূদন ব্যতিক্রম, যে তার ব্যবসায়িক বুদ্ধির, ঔপন্যাসিকের ভাষায় 'প্রতিভার জোরে' নিজের ভাগ্যই শুধুমাত্র নিজে তৈরি করে নি, বরং একটা শিল্প-সম্ভাবনাও তৈরি করেছিল। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে জানা যায়, ছাত্র মহলে 'সেকেণ্ডহ্যাণ্ড বই' বিক্রির মধ্যদিয়ে বাণিজ্য শুরু করলেও রজবপুরের কেরোসিনের এজেন্সি হয়ে যে সৌভাগ্যের দৌড় শুরু হয়েছিল 'সেই যাত্রাপথে কেরোসিনের ডিপো কোন প্রান্তে বিন্দু আকারে পিছিয়ে পড়ল। জমার ঘরের মোটা মোটা অঙ্কের উপর পা ফেলতে ফেলতে ব্যবসা হু হু করে এগোল গলি থেকে সদর রাস্তায়, খুচরো থেকে পাইকিরিতে, দোকান থেকে আপিসে'। 'গৃহপালিত বাংলাদেশে এমন অবস্থায় সহজ মানুষে বিবাহের চিন্তা' করলেও মধুসূদন তার ব্যবসার প্রসারণে মনোনিবেশ করেছে। মধুসূদন অবশ্যই অভিনন্দনযোগ্য তার ব্যবসায়িক প্রতিভা ও

দূরদৃষ্টির জন্য। সে তার অসাধারণ ব্যবসায়িক প্রতিভায় রজবপুরে শিল্প-সম্ভাবনা উপলব্ধি করেছিল এবং 'এবারও মধুসূদনের হিসেবে ভুল হল না। দেখতে দেখতে রজবপুরে ব্যাবসার একটা আওড় লাগল। তার ঘুর্ণিটানে দালালরা এসে জুটল, এল মাড়োয়ারির দল, কুলির আমদানি হল, কল বসল, চিমনি থেকে কুণ্ডলায়িত ধূমকেতু আকাশে-আকাশে কালিমা বিস্তার করলে'। (পরিচ্ছেদ - ২) অথচ এই কল স্থাপনের 'উদ্‌যোগপর্বে' যখন সস্তা দরে মধুসূদন 'নদীর ধারের পোড়ো জমি বেবাক কিনে ফেললে ... ইঁটের পাঁজা পোড়ালে বিস্তর, নেপাল থেকে এল বড়ো বড়ো শালকাঠ, সিলেট থেকে চুন, কলকাতা থেকে মালগাড়ি বোঝাই করোগেটেড লোহা', তখন বাজারের অন্যান্য ব্যবসায়িরা মধুসূদনের দূরদৃষ্টি বুঝতে পারা তো দূরের কথা বরং ভেবেছে 'হাতে কিছু জমেছিল, সেটা সইবে কেন। এবার বদহজমের পালা, কারবার মরণদশায় ঠেকল বলে'।

ঔপনিবেশিক আমলে বাঁধা মাইনের চাকরিপ্রত্যাশী বাঙালি সমাজে মধুসূদন উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। ইংরেজ আমলে বাংলাদেশে ইংরেজের অধীনে বাঁধা মাইনের চাকরি Social status এর সবচেয়ে শক্তিশালী মানদণ্ড হয়ে ওঠে। *সোমপ্রকাশ* লিখেছে (১৮৮১-৮২) -

> ''আমাদের দেশের লোকেরা পুত্রকে যে লেখাপড়া শিখান, মূলে চাকুরীই তাহার উদ্দেশ্য। পুত্র লেখাপড়া শিখিয়া কৃতী হইবেন, তাহার দ্বারা দেশের উপকার হইবে, স্বাধীন প্রবৃত্তি ও মত হইবে, এ চেষ্টা আমাদিগের দেশের লোকের অন্তঃকরণে এক মুহূর্তের জন্যও বোধ হয় স্থানপ্রাপ্ত হয় না। সমাজে বল, সভায় বল, পিতামাতা গুরুজনের নিকট বল, চাকুরীর যত সমাদর এমন কিছুরই নহে। অন্য উপায়ে সহস্র সহস্র টাকা উপার্জন কর তথাপি চাকুরীর ন্যায় লোকের তাহা তত শ্রবণসুখকর ও নয়নতৃপ্তিকর নহে। সাহেবের সহিত দুটা কথা কহিলে, সাহেব ভাল বলিলে চাকুরে ভাবে গদগদ হইয়া থাকেন। যিনি বড় চাকুরী করেন, যিনি মোটা বেতন পান অধুনা সমাজে তাহাদিগের যত সম্মান,

স্বদেশের উপকার সাধন অথবা স্বাধীন বাণিজ্য ব্যবসায় করিয়া তদপেক্ষা অধিক টাকা উপার্জন করিতেছেন তাঁহার তত সমাদর নহে। যিনি বড় চাকুরী করেন, মোটা বেতন পান তাঁহার পিতামাতা, বড় চাকুরের পিতামাতা মনে করিয়া সুখানুভব করিয়া থাকেন।"[২০]

বাঙালির এই চাকুরীপ্রিয়তা, যা আজও প্রবলভাবে বর্তমান, তা মধুসূদনের পিতামাতার মধ্যেও ছিল -

"বাপ ঠাওরালে ছেলেটার কিছু হবে। ঠেলেঠুলে গোটা দুত্তিন পাস করাতে পারলেই ইস্কুলমাষ্টারি থেকে মোক্তারি ওকালতি পর্যন্ত ভদ্রলোকদের যে-কয়টা মোক্ষতীর্থ তার কোনো-না-কোনোটাতে মধু ভিড়তে পারবে। ... মা কেঁদে মরে - বড়ো তার আশা ছিল, পরীক্ষাপাসের রাস্তা দিয়ে ছেলে ঢুকবে 'ভস্কের' শ্রেণীর ব্যূহের মধ্যে। তার পরে ঘোষাল-বংশদণ্ডের আগায় উড়বে কেরানিবৃত্তির জয়পতাকা।" (পরিচ্ছেদ - ২)

কৌতুকের সুরে ঔপন্যাসিক এই কথা-কয়টি লিখলেও নিজের ভাগ্য নিজে তৈরি করা উদ্যোগপতি মধুসূদন ঔপন্যাসিকের সহানুভূতি থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

৭.২.১. আপাত সময় ও প্রকৃত সময়ের যোগ-অযোগের পরিণতি -

উনিশ শতকে ঔপনিবেশিক অর্থনীতি যখন সবকিছু পরিবর্তিত করছিল, তৈরি হচ্ছিল নতুন ইতিহাস, তখন মধুসূদন বিপ্রদাসের মতো ইতিহাসের হাতে নিজেকে সমর্পণ করে নিশ্চিন্ত থাকে নি, যুগের সার্বিক প্রবণতাটিকে চিহ্নিত করে নিজের উদ্যমে নিজের ভাগ্য তৈরি করেছে। মধুসূদনের মতো ব্যক্তিকৃতিত্বকামি পুরুষের সংখ্যা সেদিন বেশি হলে বাংলার আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের ধারাটি নিঃসন্দেহে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হতে পারতো। বাঙালির নামের সাথে লেগেথাকা 'বাণিজ্যবিমুখ' অপবাদটিও দূর হতে পারত হয়তো। সমাজের মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোক যে কোনো প্রকারে প্রচুর ধনসঞ্চয় করলে যে দেশের উন্নতির জন্য

মূলধন সৃষ্টি হয় - এ ধারণা ঠিক নয়। জাতীয় উন্নতির জন্য প্রকৃত মূলধন সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন মূলধনের এমন বিনিয়োগ যার সুফল শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যদিয়ে জনসাধারণের মধ্যে পৌছায়। এ-কারণেই উনিশ শতকের বাংলার সাময়িকপত্রে যথেষ্ট মূলধন থাকা সত্বেও শিল্পবাণিজ্যের প্রতি বাঙালির নিষ্পৃহতা ও উদাসীনতার কঠোর সমালোচনা করা হয়েছে। *সংবাদ প্রভাকর* লিখেছে -

> (১২৫৪) "যে দেশের লোকেরা আলস্যকে আলিঙ্গন প্রদান-পূর্বক অহরহ বিনা পরিশ্রমে কালক্ষয় করেন, তাঁহারা আপন দেশকে পরের অধীন করিয়া চিরকাল দুঃখভোগ করিতে থাকেন ... এতদ্দেশীয় ব্যক্তিরা যদি আলস্য পরিত্যাগপূর্বক ইংলণ্ডবাসি লোকদিগের মত শিল্পবিদ্যায় অনুরাগি হওত বিভিন্নরূপ দ্রব্য প্রস্তুত করেন এবং জাত্যাভিমান পরিহার করিয়া বিদেশী বাণিজ্যে উৎসুক হয়েন তবে দুঃখের লেশমাত্র থাকিতে পারে না ...।"[২১]
>
> (১২৬১) "বাঙালিদিগের মধ্যে যাঁহারা পরমেশ্বরের প্রসাদে বিলক্ষণ ঐশ্বর্যশালী হইয়াছেন তাঁহারা সুদ অর্থাৎ বৃদ্ধিরদ্বারা উপার্জনকরণেই অধিক যত্নশীল, সুতরাং স্বাধীনরূপে বাণিজ্য করণের নিয়ম এদেশে একেবারে রহিত হইয়াছে ...।"[২২]

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা লিখেছে (১৭৯২ শক)

> "এক্ষণে আমাদের দেশে আর সকল বিষয়ে উৎসাহ লক্ষিত হইতেছে। আমাদের যুবকেরা আর সকল বিষয়েই যশোলাভ করিতেছেন; কি রাজনীতি, কি বিদ্যাশিক্ষা, কি ওকালতি, কি চিকিৎসা, সকল বিষয়েই জয়লাভ করিতেছেন; কেবল এই এক বিষয়ে - বাণিজ্য ব্যবসায়ে এখনও তাঁহারা নিরুদ্যম রহিয়াছেন। এ বিষয়ে বোম্বাই এর ভ্রাতৃগণ আমাদের অপেক্ষা অনেক অগ্রসর। ... বঙ্গীয় যুবকেরা তাঁহাদের এই প্রশংসিত দৃষ্টান্ত কেন না অনুসরণ করেন?"[২৩]

শিল্প-বাণিজ্যের প্রতি বাঙালিকে উৎসাহিত করার সে-সময়ের অজস্র লেখালেখি থেকে এই কয়েকটিমাত্র লেখা দৃষ্টান্ত হিসেবে তুলে ধরা হল। যা থেকে ব্যবসায়ী বা বণিক বাঙালির গুরুত্ব

ও প্রয়োজনীয়তা সে সময় কতটা অনুভূত হয়েছিল তা উপলব্ধি করা যায়।

মধুসূদন সেদিনের সেই প্রয়োজন মিটিয়েছিল। যে কঠিন অধ্যবসয় - একাগ্রতা - দৃঢ়তা - ব্যবসায়িক দূরদর্শিতায় 'রজবপুরের আন্দো মুহুরির ছেলে মেধো' রাজা মধুসূদন হয়ে ওঠে, তার জন্য আমাদের সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি অবশ্যই তার প্রাপ্য। অথচ তার সমস্ত গুণাবলী ও ব্যবসায়িক প্রতিভা ঔপন্যাসিকের অকরুণ কটাক্ষে হয়েছে মলিন। মধুসূদনের প্রভুত্বগর্বী যান্ত্রিক জীবনযাপনের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে মোতির মা'র মূল্যায়ন 'ও যে ব্যবসাদার। ওর মনে দরদ নেই কোথাও' - অব্যাপ্তি হেতুপদ দোষে দুষ্ট। ব্যবসাদার হলেই যে তার মনে কোনো দরদ থাকবে না এমন ধারণা সত্য নয়। বরং উনিশ শতকের অনেক প্রতিষ্ঠিতব্যবসায়ী তাঁদের দানশীলতা ও সহৃদয়তার জন্য সাময়িক পত্রের শিরোনামায় উঠে এসেছেন। স্বয়ং দ্বারকানাথ ঠাকুর তো ছিলেনই, যাঁর দানশীলতা ছিল অমিতব্যয়িতার নামান্তর। এছাড়াও মতিলাল শীল 'শিষ্ট, মিষ্টভাষী ও পরোপকারী লোক ছিলেন। ১৮৪২ অব্দে একটি অবৈতনিক কলেজ স্থাপন করেন'।[২৪] পুণ্যকর্মে রামদুলাল দে বহু অর্থ ব্যয় করেছিলেন।[২৫] বাংলার বাইরে মধুসূদনের সমসাময়িক ব্যবসায়ী সম্পর্কে *সোমপ্রকাশ* লিখেছে (১২৮৫) "ব্যবসায়ী বোম্বাইবাসী প্রেমচাঁদ, রায়চাঁদ যাঁহাদের নামে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্টুডেন্টসি পরীক্ষোত্তীর্ণ দুই জন ছাত্রের ১০০০০ টাকা বৃত্তি নির্ধারিত আছে। আনুমানিক কোটি টাকা তাঁহাদের আয় ও পুণ্য কার্যেও অসংখ্য টাকা ব্যয়।"[২৬] ইংলণ্ডের মতো এদেশে 'ভদ্রলোকের পুঁজিবাদ' (Gentlemanly capitalism) তৈরি না হলেও[২৭] উল্লিখিত বণিকেরা কেউই অন্তত অভদ্র ছিলেন না।

তবুও মধুসূদন যে বিকৃতভাবে উপস্থাপিত হল, তার কারণ সম্ভবতঃ ঔপন্যাসিকের রচনাকালীন অভিজ্ঞতার অভিক্ষেপ গল্পকালে প্রযুক্ত হওয়া। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন - "ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথের বাস্তববাদ বুদ্ধিমার্গীয় বাস্তববাদ। ... এই বুদ্ধিমার্গীয় বাস্তববাদকে ব্যবহার করেই রবীন্দ্রনাথ যখন আমাদের শতাব্দীর তৃতীয় দশকের উপক্রমণিকায় এসে পৌঁছলেন

তখন বাঙালি মধ্যবিত্তের ইতিহাসও এক সন্ধিলগ্নে এসে দাঁড়িয়েছে। মধ্যবিত্ত নায়কের চলিষ্ণু সত্তা তখন দ্বিধাহত, খণ্ডিত এবং দিকহারা। গোরা এবং অমিতের মধ্যে যে পার্থক্য তার রহস্য যত গভীর, অমিত এবং মধুসূদনের মধ্যে যে বিরুদ্ধতা তার তাৎপর্য তার থেকে অনেক বেশি মর্মান্তিক। বাঙালি মধ্যবিত্তের সকল প্রতিশ্রুতির করুণ পরিনামকে ঔপন্যাসিক এই দুই উপন্যাসের দুই চরিত্রে রূপ দিয়েছেন। একদিকে লক্ষ্যহীন বৈদগ্ধ্য, আর একদিকে কলোনির লোভের এবং দৈন্যের জারজ।"[২৮] এক্ষেত্রে আমাদের ধারণা, *তিন পুরুষ* নাম দিয়ে তিন প্রজন্মের উপস্থাপনের প্রতিশ্রুতি নিয়ে যে উপন্যাসের সূচনা, বত্রিশ বছর বয়স্ক অবিনাশ ঘোষালের জীবনে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী বিশ-ত্রিশের দশকের 'বাঙালি নায়কের দ্বিধা ও খণ্ডায়নের' অভিঘাত পড়া স্বাভাবিক ছিল, তার আগের প্রজন্ম মধুসূদনের চরিত্রে নয়। উপন্যাসটির রচনাকালীন সময়ে যখন মধুসূদনের উত্তরসূরীরা নির্লজ্জ মুনাফাখোরে পরিণত হয়েছিল, যাদের কাছে সবই ক্রয়-বিক্রয়যোগ্য, যাদের প্রবল অর্থমদমত্ততা বিশ শতকের চল্লিশের দশকে জীবনানন্দকে 'পৃথিবীর এইসব উঁচু লোকদের দাবি এসে / সবই নেয়, নারীকেও নিয়ে যায়'[২৯] লিখতে প্রাণিত করেছিল, মধুসূদন তাদের পূর্বপুরুষ, সে নিজে নয়।

৭.২.২. প্রেম এসেছিল নিঃশব্দ চরণে -

'সামন্ততন্ত্র থেকে ধনতন্ত্রের স্তরে যাত্রাপথে সমাজের অর্থনীতিক ভিত্তিতে একটা বড় রকমের রূপান্তর ঘটেছিল। গৃহশিল্প কারুশিল্প থেকে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রশিল্পের পথে অগ্রগতি এই রূপান্তরের অন্যতম কারণ সন্দেহ নেই, কিন্তু তার সঙ্গে আরও একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল - যাকে এক কথায় বলা যায় মানুষের মধ্যে টাকাসর্বস্ব মানসতার (money-oriented mentality) বিকাশ। এই মানসতার বিকাশ হয়েছিল অর্থনীতিক ক্ষেত্রে একটা যুগান্তকারী পরিবর্তনের জন্য। সেই পরিবর্তন হল, স্বাভাবিক অর্থনীতির (Natural economy) স্তর থেকে টাকার অর্থনীতির (money economy) স্তরে উত্তরণ।'[৩০] মধুসূদনের মধ্যে টাকাসর্বস্ব মানসতার যে পরিচয় পাওয়া যায় তার পেছনে এই money economy বা

exchange economy ক্রিয়াশীল থাকলেও এই মধুসূদনের মধ্যেই সহৃদয় প্রেমিক পুরুষের চকিত স্ফুরণও ঘটেছে। যার ফলে মধুসূদনকে নিছক দেহমাত্র-সর্বস্ব স্থূল টাইপ চরিত্র বলে মনে হয় না। মধুসূদন সম্পর্কে ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত লিখেছেন -

> ‘‘মধুসূদনকে তো মানুষ বলিয়াই মনে হয় না; সে যান্ত্রিকতার দানব। সে রক্তে মাংসে গড়া মানুষ নহে; আত্মপ্রতিষ্ঠার ও লোভের প্রাণহীন প্রতীক।’’[৩১]

অপরদিকে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের মূল্যায়ন এর ঠিক বিপরীত -

> ‘‘ঔপন্যাসিক চরিত্র হিসাবে সব চাইতে সার্থক মধুসূদন। বিপ্রদাস কুমুদিনী এবং মধুসূদন - এই ত্রয়ী ব্যক্তিত্বের মধ্যে মধুসূদনই উজ্জ্বলতম। সে কুমুদিনীর মতো আইডিয়া নয়, বিপ্রদাসের মতো মহৎ ব্যক্তিত্ব নয়, নবীন-মোতির মা-র মতো টাইপ নয়, এমন কি শ্যামাসুন্দরীর মতো দেহসর্বস্ব লোলুপতাও নয়। সে পরিপূর্ণ রক্তমাংসের মানুষ - সহজ এবং স্বাভাবিক।’’[৩২]

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মূল্যায়ন ভিন্নধর্মী -

> ‘‘মধুসূদন সম্বন্ধে আমাদের অভিযোগ সংক্ষেপে ব্যক্ত করতে গেলে বলতে হয় - উপনিবেশের হাটের বণিক-আত্মা মধুসূদনের চরিত্রে যেমন পরিস্ফুট, তার ব্যক্তিসত্তার নিজস্ব অভিজ্ঞান ততটা নয়। অর্থাৎ সে টাইপ হিসেবে যতখানি সার্থক, ইনডিভিজুয়াল হিসেবে সে ততখানি ব্যর্থ।’’[৩৩]

আমাদের পাঠে মধুসূদন ঔপন্যাসিকের সহানুভূতিবঞ্চিত একজন যথার্থ রক্তমাংসের মানুষ। যে তার প্রবল প্রভুত্বগর্বীতার আবরণ ভেদ করে তার অজ্ঞাতেই প্রকাশ করে ফেলেছে তার প্রেমিক সত্তাটিকে।

বিবাহের পর ‘মধুসূদনের পক্ষে কুমু একটা নতুন আবিষ্কার’ রূপে প্রতিভাত হয়েছে। শুধুমাত্র দেহ নয়, এই নতুন আবিষ্কারের মন পাবার জন্য যে মধুসূদন ব্যগ্র হয়ে ওঠে, তাকে শুধুমাত্র স্থূল - দেহসর্বস্বতা কিংবা ‘টাইপ’এর একমাত্রিক গণ্ডিতে আবদ্ধ করা যায় না।

'বউরানী তোমার জন্যে হয়তো জেগে বসে আছেন' (পরিচ্ছদ - ৪৫) নবীনের এই উক্তি যখন 'বৃষ্টি থেমে গেছে, কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ বাগানের কোণে এক প্রাচীন সিসু গাছের উপরে আকাশে উঠে আর্দ্র পৃথিবীকে বিহ্বল করে দিয়েছে', তখন ব্যবসায়ের সংকটকালে কর্মব্যস্ত মধুসূদনকে টেনে নিয়ে গেছে কুমুদিনীর কাছে। এ কি শুধুই কুমুদিনীর শারীরিক উত্তাপের মধ্যদিয়ে mental relief এর জন্য! তা যে নয়, তার সাক্ষ্যও উপন্যাসেই আছে - ''জেগে বসে আছেন কথাটা এক মুহূর্তে মধুসূদনের মনের ভিতরে গিয়ে লাগল। ঢেউয়ের উপর দিয়ে জাহাজ যখন টল্ মল্ করতে করতে চলেছে, একটি ছোটো ডাঙার পাখি উড়ে এসে যেন মাস্তুলে বসল; ক্ষুব্ধ সমুদ্রের ভিতর ক্ষণকালের জন্য মনে এনে দিল শ্যামল দ্বীপের নিভৃত বনচ্ছায়ার ছবি।'' (পরিচ্ছেদ - ৪৫) - এই বর্ণনা দৈহিক চাহিদার ইঙ্গিত দেয় না, বরং ইঙ্গিত করে আরও গভীর কোনো এক আশ্রয়ের দিকে, যে আশ্রয়ের কথা জীবনানন্দ দাশ শুনিয়েছিলেন 'পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে' প্রতীক্ষারতা কোনো এক 'মানুষী'র মধ্যে কোনো এক 'মানুষের' আশ্রয়গ্রহণের ভাবকল্পে কিংবা 'অতিদূর সমুদ্রের পর / হাল ভেঙে যে নাবিক হারায়েছে দিশা / সবুজ ঘাসের দেশ যখন সে চোখে দেখে দারুচিনি-দ্বীপের ভিতর, / তেমনি দেখেছি তারে ...'[৩৪] কাব্যিক মূর্চ্ছনায়। এই আশ্রয় মধুসূদনের কাছে যে কতটা আবশ্যিক ছিল তা বোঝা যায় ঔপন্যাসিকের interpretation এ, ''ভালোবাসার ভিতর দিয়ে মানুষ আপনার যে পরম মূল্য উপলব্ধি করে, আজ রাত্রে সেই অনুভব করবার প্রয়োজন মধুসূদনের ছিল।'' আশ্রয়প্রত্যাশী মধুসূদন ব্যর্থ মনোরথে শ্যামাসুন্দরীকে যে কাছে টেনে নিয়েছে, সেটাও যে শ্যামাসুন্দরীর মধ্যদিয়ে শারীরিক ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য নয়, বরং আহত অহংবোধ শ্যামাসুন্দরীর মধ্যে বিকল্প আশ্রয়ের সন্ধান পেয়ে সান্ত্বনা লাভ করেছে বলে, তা বোঝা যায় ঔপন্যাসিকের বিশ্লেষণে - ''কুমুর কাছ থেকে যে উপেক্ষা পেয়েছে তার ক্ষতিপূরণের ভাণ্ডার অন্য কোথাও জমা আছে এটুকু সে বুঝে নিলে। ... শ্যামাসুন্দরী সমস্ত জীবনমন দিয়ে ওর জন্যে অপেক্ষা করে আছে, সেই আশ্বাসটুকু পেয়ে মধুসূদন আজ রাত্রে কাজের জোর পেলে, যে অমর্যাদার কাঁটা ওর মনের মধ্যে বিঁধে আছে তার বেদনা অনেকটা কমিয়ে দিলে।'' - আর এ-কারণেই,

অর্থাৎ মধুসূদন শরীর-সর্বস্ব নয় বলেই শ্যামার মধ্যদিয়ে শারীরিক ক্ষুধা মেটানোর ক্লান্তি তাকে গ্রাস করেছে।

প্রবল শৃঙ্খলাপরায়ণ মধুসূদন, যে সামান্য অনিয়মে নিজের বেতন নিজে কাটে, বৎসরের পর বৎসর আপিসে যেতে যার পাঁচ মিনিট দেরি হয়নি, মোতির মা'র দৃষ্টিতে যে 'নিজের গোলামি নিজে করে', সেই মধুসূদন অতৃপ্ত ভালোবাসার তাড়নায় তার বহুকাল লালিত নিয়মের ব্যত্যয় ঘটিয়েছে - ''মনে মনে আজ সে পণ করেছে যে, অপরাহ্ণে আপিসের সময় উত্তীর্ণ হলে অতিরিক্ত সময় কাজ করে ক্ষতিপূরণ করে নেবে। বেলা যতই পড়ে আসছে, কাজে মন দিতে আর পারে না। এমন-কি, আজ আধঘন্টা সময় থাকতেই কাজ ফেলে বাড়ি ফিরে এল। কেবলই ইচ্ছে করছিল অসময়ে একবার শোবার ঘরে এসে ঢুকতে। হয়তো কাউকে দেখতে পেতেও পারে।'' (পরিচ্ছেদ - ২৯) ধন সৃষ্টির তপস্যায় যার সমস্ত প্রতিভা নিয়োজিত সেই মধুসূদনের যখন ডাইরেক্টরদের মিটিঙের মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজেও শৈথিল্য প্রকাশ পায়, তখন একে শুধুই অতৃপ্ত যৌনতা বলা যায় না।

মোটা ভাত আর কলাইয়ের ডাল দিয়ে ক্ষুধা নিবৃত্তি করা মধুসূদনের 'ক্ষুধা আছে, লোভ নেই' বলে যতই স্থূল করে চিত্রিত করা হোক না কেন, এই মধুসূদনের মধ্য থেকেই প্রেমিক পুরুষের চকিত আত্মপ্রকাশ ঘটেছে একাধিকবার। ৩২ সংখ্যক পরিচ্ছেদে নিদ্রিতা কুমুদিনীর মুখের অনির্বচনীয় সম্পূর্ণতা' লক্ষ্য করে 'মধুসূদন মনে স্থির করলে, কুমুকে না জাগিয়ে সমস্ত রাত্রি ওর পাশে এমনি করে জেগে বসে থাকবে.' - এটা প্রভুত্বগর্বী 'টাইপ' মধুসূদন নয়, প্রেমিক মধুসূদন। এই মধুসূদনই যখন বলে - 'বড়োবউ আমার উপর রাগ কোরো না' কিংবা 'বড়োবউ তোমার মন কি পাথরে গড়া?' বা 'আমি তোমার অযোগ্য, কিন্তু আমাকে কি দয়া করবে না?' (পরিচ্ছেদ - ৩৭) তখন এর মধ্যে প্রভুর হুকুম থাকে না, থাকে 'প্রণয়ীর মিনতি'। ৩৭ সংখ্যক পরিচ্ছেদে কুমুদিনীর রূপমুগ্ধ মধুসূদনের মনোভাব লক্ষণীয় -

'মধুসূদন ওকে আবার যেন নতুন করে দেখলে। ওর মহিমায় আবার সে বিস্মিত হল। মধুসূদনের চিরার্জিত সমস্ত সম্পদ এতদিন পরে শ্রীলাভ করেছে এ কথা না মনে করে সে থাকতে পারলে না। ... আজ গ্যাসের আলোতে শোবার ঘরের দরজার পাশে ঐ-যে মেয়েটি স্তব্ধ দাঁড়িয়ে, তাকে দেখে মধুসূদনের মনে হল, আমার যথেষ্ট ধন নেই - মনে হল, যদি রাজচক্রবর্তী সম্রাট হতুম তা হলেই ওকে এ ঘরে মানাত।' ঔপন্যাসিক কৃত মধুসূদনের এহেন মনোভাব কোনো প্রভুত্বগর্বী যান্ত্রিক মানুষের হতে পারে না। কিংবা ৩৭ সংখ্যক পরিচ্ছেদে কুমু বিছানায় প্রবেশ করার পর সোফার উপর বসে মধুসূদন যখন বলে - "এইখানেই বসে রইলুম, যদি আমাকে ডাক তবেই যাব। বৎসরের পর বৎসর অপেক্ষা করতে রাজি আছি" তখন প্রভুত্বগর্ব বা স্থূল যৌনাকাঙ্খা নয়, বরং কুমুদিনীর মন পাবার জন্য কাতর প্রেমিক মধুসূদনের কণ্ঠস্বর স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ-কারণে 'তার কাছে কুমুর হৃদয়ের কোনো মূল্য নেই। মধুসূদনের কাছে দেহের উপর অধিকারই বড়',[৩৫] সমালোচকের এহেন মূল্যায়ন মধুসূদনের জীবনপ্যাটার্ন সমর্থিত বলে মনে হয় না। কুমু যে মধুসূদনের কাছে নিছক স্ত্রীরূপী যৌনপুত্তলিকা নয়, বরং আরও বড় কিছু, ঔপন্যাসিক তা জানিয়েছেন - 'কিন্তু কুমু যে ওর কাছে মন্ত্র-পড়া স্ত্রীর চেয়ে অনেক বেশি' - অর্থাৎ মধুসূদন নিছক দেহমাত্রসর্বস্ব স্থূল নয়, হলে কুমুদিনীর মধ্যে 'স্ত্রীর চেয়ে অনেক বেশি' কিছুর প্রত্যাশা মধুসূদনের মনে জাগত না। তবু যে 'সেই বেশিটুকু পাবার জন্য ও যতই মূল্য হাঁকছে সবই ব্যর্থ' হয়েছে, তার কারণ, জীবনগড়ার কঠোর সাধনায় নিয়োজিত মধুসূদনের জীবনে নারী সম্পর্কে অজ্ঞতা - "স্ত্রীজাতির পরিচয় পায় এ পর্যন্ত এমন অবকাশ এই কেজো মানুষের অল্পই ছিল। ওর পণ্যজগতের ভিড়ের মধ্যে পণ্য-নারীর ছোঁওয়াও ওকে কখনো লাগে নি। কোনো স্ত্রী ওর মনকে কখনো বিচলিত করে নি এ কথা সত্য নয়, কিন্তু ভূমিকম্প পর্যন্তই ঘটেছে - ইমারত জখম হয় নি। মধুসূদন মেয়েদের অতি সংক্ষেপে দেখেছে ঘরের বউঝিদের মধ্যে। তারা ঘরকন্নার কাজ করে, কোঁদল করে, কানাকানি করে, অতি তুচ্ছ কারণে কান্নাকাটিও করে থাকে। মধুসূদনের জীবনে এদের সংস্রব নিতান্তই যৎসামান্য।" (পরিচ্ছেদ - ২০) নারী

সম্পর্কে এই যৎসামান্য জ্ঞান নিয়ে 'স্ত্রীর সঙ্গে ব্যবহারের কলানৈপুণ্য' অজ্ঞ মধুসূদন তার জীবনে 'নতুন আবিষ্কার' কুমুদিনীর মন লাভ করতে যে ব্যর্থ হয়েছে - 'এ তার দুর্ভাগ্য - অপরাধ নয়'।

৭.২.৩. মধুসূদনঃ দ্বিধাগ্রস্থ ঔপন্যাসিকের সৃষ্টি -

আমাদের প্রতীতিতে মধুসূদন তাই রক্তমাংসে গড়া এক সজীব চরিত্র। পরিণতিতে আত্মোপলব্ধিতে উত্তীর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা মধুসূদন চরিত্রে যথেষ্ট থাকা সত্ত্বেও উপন্যাসের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সে যে একই রকম রয়ে গেল - তার ফলে চরিত্রটি কোনো কোনো সমালোচকের কাছে যে খণ্ডিত বা অসম্পূর্ণ বলে মনে হয়েছে, তা অযৌক্তিক নয়।

> ''মধুসূদন যদি খলনায়ক হত, যদি তার ব্যবসায়িক প্রতিভা সত্য না হত, যদি সত্য হত শ্যামার আসঙ্গে তার সন্তুষ্টি এবং অভিনয় হত কুমুর জন্য ব্যাকুলতা, তবে তাকে দ্বন্দ্বময় অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে কোনো পরিণামে পৌঁছিয়ে দেবার দায় লেখকের থকত না। কিন্তু মধুসূদন তো খলনায়ক নয়, নায়ক। যে ভাবে রবীন্দ্রনাথ তার ছবিটি শেষ করেছেন তাতে তাকে অসম্পূর্ণ মনে হয়। শুরুতে যেমন, শেষেও মধুসূদন সেই একই রকম থেকে গেল; কুমু তার জীবনে একটা অভিনব অভিজ্ঞতা মাত্র, সেই অভিজ্ঞতা থেকে সে উত্তীর্ণ হল না কোনো নতুন জীবনবোধে।''[৩৬]

*চোখের বালি*র মহেন্দ্র, *ঘরে-বাইরে*র সন্দীপ এরা সকলেই যখন আত্মোপলব্ধিতে উন্নীত হয়েছে, তখন ব্যতিক্রম মধুসূদন, অথচ এমনটা হওয়া উচিৎ ছিল না। তবু যে এমনটা হল, তার কারণ সম্ভবত তিন-পুরুষের বৃহৎ প্রেক্ষাপটে উপন্যাসটির পরিকল্পনা করা সত্ত্বেও *যোগাযোগ*-এর মধ্যে শেষ রক্ষা করতে না পারা এবং মধুসূদনের প্রতি ঔপন্যাসিকের প্রচ্ছন্ন অবজ্ঞা, যা উপন্যাসটির শিল্প অসঙ্গতিরও কারণ বলে মনে করেছেন রবীন্দ্রনাথ গুপ্ত -

> ''সামন্ত মুকুন্দলালের প্রতি লেখকের সহানুভূতি এবং মধুসূদনের প্রতি প্রকট

অবজ্ঞা ঔপন্যাসিক শিল্পসঙ্গতি নষ্ট করেছে। মুকুন্দলালের 'একমহলে দশকর্ম, আর এক মহলে একাদশ অকর্ম', হলেও তার কর্তব্যবোধ, স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা নাকি আন্তরিক ছিল। ... অর্থাৎ বনেদী আভিজাত্যের গণ্ডীতে কিছু আতিশয্যদোষ থাকলেও সে চাঁদের কলঙ্ক। মধুসূদনের মতো হঠাৎ-বড়লোক বেনের ঘর অচন্দ্রস্পশ্য। 'পাটের বস্তা থেকে হাতী বের হয় না' ভেবে লেখকও গল্পের নেপথ্যে বিলক্ষণ হেসেছেন। একদিকে রেনেসাঁসের অনুপ্রেরণা, লিবার্টি চিন্তা, নারী-পুরুষের সমানাধিকার, ইম্পারসোন্যাল সতীধর্মে অনাস্থা, অন্যদিকে সামন্তসমাজের বনেদী আভিজাত্যের মোহ, অর্থ-মোক্ষের উর্ধে দৃষ্টি, বাজে-খরচের উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যেও বড় ব্যক্তিত্বের ইঙ্গিত তাঁকে দ্বিধাগ্রস্ত করেছে। রবীন্দ্র-মানসের এই দ্বিধার ফলেই চরিত্রাঙ্কনে বিপর্যয় ঘটেছে।"[৩৭]

- ৩ -

৭.৩. তিন পুরুষ থেকে যোগাযোগ ঃ যোগ ও অযোগের আখ্যান -

তিন পুরুষ নাম দিয়ে *বিচিত্রার* প্রথম দুই সংখ্যায় *যোগাযোগ*-এর প্রকাশ ঘটার পর তৃতীয় সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসটির নাম রাখেন *যোগাযোগ*। এই উপলক্ষে *বিচিত্রার* অগ্রহায়ণ ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ সংখ্যায় যে কৈফিয়ত প্রকাশিত হয়, তাতে রবীন্দ্রনাথ লেখেন - "তিন পুরুষ নাম ধরে আমার যে গল্পটা বিচিত্রায় বের হচ্ছে তার নাম রক্ষা করতেই হবে এমন কোনো দায় নেই। কাঁচা থাকতে থাকতেই ও নামটা বদল করব বলে স্থির করেছি। ... এমন একটা কিছু অবলম্বন করে গল্প লিখতে বসলুম যাকে বলা যেতে পারে বিষয়। যদি মূর্তি গড়তেম একতাল মাটি নিয়ে বসতে হত। অতএব ওটাকে 'মাটি' শিরোনামায় নির্দেশ করলে বিজ্ঞানে বা তত্ত্বজ্ঞানে বাধত না। ... রসশাস্ত্রে মূর্তিটা মাটির চেয়ে বেশি, গল্পটাও বিষয়ের চেয়ে বড়ো। এইজন্যে বিষয়টাকেই শিরোধার্য করে নিয়ে গল্পের নাম দিতে আমার মন যায় না। বস্তুত রসসৃষ্টিতে বৈষয়িকতাকে বড়ো জয়গা দেওয়া উচিত হয় না। যাঁরা বৈষয়িক প্রকৃতির

পাঠক তাঁদের দাবির জোরে সাহিত্যরাজ্যে হাটের পত্তন হলে দুঃখের বিষয় ঘটে। হাটের মালিক বিষয়বুদ্ধিপ্রধান বিজ্ঞান। ...

রূপের আমরা নাম দিই, বস্তুর দিই সংজ্ঞা। সন্দেশ যেখানে রূপ সেখানে তাকে বলি 'অবাক চাকি', যেখানে বস্তু সেখানে তাকে বলি মিষ্টান্ন। ...

গল্প জিনিসটাও রূপ; ইংরেজিতে যাকে বলে ক্রিয়েশন। আমি তাই বলি গল্পের এমন নাম দেওয়া উচিত নয় যেটা সংজ্ঞা, অর্থাৎ যেটাতে রূপের চেয়ে বস্তুটাই নির্দিষ্ট। ...

সম্পাদকমশায় যখন গল্পের নামের জন্য পেয়াদা পাঠালেন তাড়াতাড়ি তখন 'তিন পুরুষ' নামটা দিয়ে তাঁকে বিদায় করা গেল। তার পরক্ষণেই নামটা কাহিনীর আঁচলের সঙ্গে তার গ্রন্থিবন্ধন করে নিয়ে কানে কানে মুহূর্তে মুহূর্তে বলতে লাগল; যদেতৎ অর্থং মম তদস্তু রূপং তব। আমার সঙ্গে তোমাকে সম্পূর্ণ মিলে চলতে হবে। 'ছায়েবানুগতাস্বচ্ছা' ইত্যাদি। কাহিনী বলে, তার মানে কী হল? নাম বলে, বাক্যে ভাবে আজ থেকে আমাকে সপ্রমাণ করে চলাই তোমার ধর্ম। কাহিনী বলে, রেজিস্টার বইয়ে কর্তার তাড়ায় সম্মতি সই করেছি বটে, কিন্তু আজ আমি হাজার হাজার পাঠকের সামনে দাঁড়িয়েই সেটা বেকবুল যেতে চাই। কর্তা বলেন, তিন পুরুষের তিন-তোরণ ওয়ালা রাস্তা দিয়ে গল্পটা চলে আসবে এই আমার একটা খেয়ালমাত্র ছিল। ... সুতরাং এই নামটা ত্যাগ করলে আমার গল্পের কোনো স্বত্বের দলিল কাঁচবে না। ...

গল্প নিজেই নিজের পরিচয় দেবার সাহস রাখে যেন, নামটাকে যেন জোর গলায় আগে আগে নকিবগিরি করতে না পাঠায়। 'তিন পুরুষ' নাম ঘুচিয়ে আমার গল্পের নাম দেওয়া গেল 'যোগাযোগ'।"[৩৮]

এই কৈফিয়ত থেকে যে সিদ্ধান্তে আসা যায় তা হল -

এক. নামকরণ সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন রবীন্দ্রনাথ 'তিন পুরুষ' এর পরিবর্তে যখন 'যোগাযোগ' নামটি ব্যবহার করেছেন, তখন এই 'যোগাযোগ' শব্দটির মধ্যদিয়ে কুমুদিনী ও মধুসূদনের ব্যক্তিত্বের যোগ ও অযোগের দিকে নির্দেশ করাই শুধুমাত্র তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না।

কেননা, যেহেতু তিনি বিশ্বাস করতেন 'রূপের আমরা নাম দিই বস্তুর দিই সংজ্ঞা' এবং 'গল্প জিনিসটাও রূপ' তাই 'গল্পের এমন নাম দেওয়া উচিত নয় যেটা সংজ্ঞা, অর্থাৎ যেটাতে রূপের চেয়ে বস্তুটাই নির্দিষ্ট'। *যোগাযোগ* নামকরণ যদি কুমুদিনী ও মধুসূদনের ব্যক্তিত্বের যোগ ও অযোগের দিকে নির্দেশ করেই নিঃশেষ হয়ে যায়, তবে তা হবে নামকরণ সম্পর্কে রবীন্দ্র-প্রত্যয়ের প্রতি চূড়ান্ত অবিচার। এক্ষেত্রে আমাদের ধারণা যোগাযোগ নামকরণ আরও গভীর কোনো তাৎপর্যের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশের সম্ভাবনা রাখে।

দুই. রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন - 'সম্পাদকমশায় যখন গল্পের নামের জন্য পেয়াদা পাঠালেন তাড়াতাড়ি তখন তিন পুরুষ নামটা দিয়ে তাঁকে বিদায় করা গেল' এবং এর পরই তাঁর উপলব্ধি হল, 'তিন পুরুষ' নামটি 'কাহিনীর আঁচলের সঙ্গে তার গ্রন্থিবন্ধন করে নিয়ে কানে কানে মুহূর্তে মুহূর্তে বলতে লাগল; যদেতৎ অর্থং মম তদস্তু রূপং তব। আমার সঙ্গে তোমাকে সম্পূর্ণ মিলে চলতে হবে'। - কথাগুলি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বললেও তা নির্দ্বিধায় মেনে নেওয়া যায় না। প্রথমত, নামকরণ সম্পর্কে অতি সচেতন ও সাবধানী রবীন্দ্রনাথ শুধুমাত্র সম্পাদকের তাড়নায় দুম করে দায়সারা গোছের এমন একটা নাম কি দিতে পারেন যা যে গল্প কয়েক কিস্তি লেখা হল, তার রূপের পরিচয়বাহী নয়। দ্বিতীয়ত, তিন পুরুষ নামটি দেওয়ার পর তাঁর মনে হল গল্পটাকে এমনভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে যাতে নামের সাথে justified হয়। তার মানে কি রবীন্দ্রনাথ আগে নামকরণ ঠিক করতেন, তার পর প্লট পরিকল্পনা করতেন। নিশ্চয় তা নয়, নইলে বিনোদিনীর খসড়া *চোখের বালি* হয়ে প্রকাশিত হত না।

এক্ষেত্রে আমাদের ধারণা, রবীন্দ্রনাথ যদিও বলেছেন, 'তিন পুরুষের তিন-তোরণ ওয়ালা রাস্তা দিয়ে গল্পটা চলে আসবে' এটা তাঁর 'খেয়ালমাত্র ছিল', আমাদের বিবেচনায় এটা নিছক খেয়ালমাত্র ছিল না, বরং এ-জাতীয় প্লট পরিকল্পনা রবীন্দ্রনাথ সচেতনভাবেই করেছিলেন। নাহলে উপন্যাসের সূচনা অন্ততঃ তিন পুরুষের উপস্থাপনের মহাকাব্যিক সম্ভাবনা নিয়ে হত না। রবীন্দ্রনাথ এর কৈফিয়তে যদিও বলেছেন নাম পরিবর্তনে তাঁর 'গল্পের কোনো স্বত্বের

দলিল কাঁচবে না', আমাদের বিবেচনায় স্বত্বের দলিল না কাঁচলেও প্রতিশ্রুতিভঙ্গের দায় থেকেই যায়। উপরন্তু গল্প যা হওয়া উচিত ছিল, তার অভিঘাত যা হয়ে উঠল তার উপর পড়ার সম্ভাবনা রাখে, যা পরিণামে যেটা হয়ে উঠল তার শিল্পরূপের ক্ষেত্রে হানিকর হয়ে ওঠে। *যোগাযোগ* উপন্যাসেও ঔপন্যাসিক পাঠকের মনে অনেক প্রশ্ন জাগালেও তার কোনো উত্তর দেন নি। যোগাযোগের সমাপ্তি পাঠকের মনে একটা অতৃপ্তির সঞ্চার করে। সমালোচকের মতে -

> "তাতে প্রতিশ্রুত মূল গল্পটা অনুক্ত থেকে গেছে; এবং তা সত্ত্বেও তার অবিচল প্রারম্ভিক কথাবস্তুর অবস্থান যথাবর্ণিত গল্প - কৌতূহলের ওপরে প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া সঞ্চার করে থাকে। 'গল্প'টার আরম্ভ হয়েছিল অবিনাশ ঘোষালের বত্রিশ বছরের জন্মদিনে। এক নিঃশ্বাসে ঔপন্যাসিক জানিয়েছিলেন - 'আরম্ভের পূর্বেও আরম্ভ আছে। সন্ধ্যা বেলায় দীপ জ্বালার আগে সকাল বেলায় সলতে পাকানো।' আগাগোড়া যোগাযোগ উপন্যাসে সেই 'সলতে পাকানো'র খবরটাই আছে আবর্তিত কুটিল সংঘট্টের টানাপোড়েনে। সন্ধ্যাদীপ আর মোটেই জ্বলে নি। তাতে আলো-আঁধারি আবছায়া চেপে বসেছে গল্পের গায়ে - যে গল্প বলা হয়েছে, তারও।"[৩৯]

উপন্যাসটির এহেন সমাপ্তি যে সীমাবদ্ধতা আনতে পারে, সে সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথও যথেষ্ট অবহিত ছিলেন বলেই হয়তো পুত্র রথীন্দ্রনাথকে একটি চিঠিতে লিখেছেন- "যোগাযোগটাকে মাঝখানে এক জায়গায় থামিয়ে দেওয়া গেল। আবার যদি কখনো ইচ্ছা হয় তবে অন্য একটা নাম দিয়ে এর আবার একটা অংশ লেখবার চেষ্টা করা যাবে।"[৪০] রবীন্দ্রনাথের এই স্বীকারোক্তির ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। তিন পুরুষের পরিবর্তে যোগাযোগ নামকরণের রবীন্দ্রনাথকৃত কৈফিয়তটি 'বিচিত্রা'য় প্রকাশিত হয়েছিল উপন্যাসটির রচনাকালে। অপরদিকে রথীন্দ্রনাথকে লেখা উদ্ধৃত পত্রটি উপন্যাসটির রচনা পরবর্তী সময়ের লেখা, যেখানে 'যোগাযোগটাকে মাঝখানে এক জায়গায় থামিয়ে' দেওয়ার স্বীকারোক্তি পাওয়া যায়। আমাদের বিবেচনায় উপন্যাসটির আকস্মিক

সমাপ্তিজনিত দুর্বলতা কুমুদিনী ও মধুসূদনের চিত্রিত জীবনপ্যাটার্নকেও প্রভাবিত করেছে।

> "তিন পুরুষে মহৎ উপন্যাসের বীজ উপ্ত হইয়াছিল, কিন্তু মূল পরিকল্পনা পরিবর্তিত হইয়া যখন যোগাযোগে রূপান্তরিত হইল তখন সে সম্ভাবনা ঘুচিয়া গেল। অথচ হ্রস্বায়িত প্রেক্ষাপটে ইহার গতির মহাকাব্যীয় মন্থরতা লাগিয়াই রহিল; ঘটনা ও চরিত্রাবলী যুক্তিপরম্পরাগত চরম পরিণতি লাভ করিল না, এবং গ্রন্থারম্ভে যে-সব প্রশ্ন সূচিত হইল, যে গল্প-সীমানা পরিকল্পিত হইল, তাহার উত্তর মিলিল না, এবং সীমানার বৃত্ত সম্পূর্ণ হইল না। যোগাযোগ একটি মহৎ বৃহৎ পরিকল্পনার অসাফল্যের স্বীকৃতি।"[৪১]

সমালোচকের এই মন্তব্যের সাথে সম্পূর্ণ একমত না হলেও তিন পুরুষের অভিঘাত যে *যোগাযোগ* এর চরিত্র সৃজনে প্রভাব ফেলেছে তা অস্বীকার করা যায় না।

নির্দেশিকা ঃ-

১. রায়, রথীন্দ্রনাথঃ *রবীন্দ্র-মনন*, কলকাতা ঃ ১৯৮৭, পৃঃ ২০

২. গুপ্ত, রবীন্দ্রনাথ ঃ "রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস"। *রবীন্দ্রনাথ ঃ শতবার্ষিকী প্রবন্ধ সংকলন*। সম্পাঃ গোপাল হালদার, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, কলকাতা ঃ ১৯৯৮, পৃঃ ৫৩

৩. সিকদার, অশ্রুকুমার ঃ *আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস*, কলকাতা ঃ ১৩৯৫, পৃঃ ১৩

৪. "নারীর উক্তি", *মানসী*, রবীন্দ্র-রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা ঃ ১৩৯১, পৃঃ ১৬৬

৫. দাশ, অমরেশ ঃ *রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস ঃ নবমূল্যায়ন*, কলকাতা ঃ ২০০২, পৃঃ ১৬১

৬. রায়, নীহাররঞ্জনঃ *রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভূমিকা*, কলকাতা ঃ ১৩৬৯, পৃঃ ৪৩৭

৭. *হিন্দুবিবাহ*, রবীন্দ্র-রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, কলকাতা ঃ ১৩৯৪, পৃঃ ৪২৪-২৯

৮. *Literacy rates for 1961 to 2011*, web.20 Nov.2013<http// www.censusindia.in

৯. *Crime against women (under both IPC and SLL) from 2006 to 2012* [UNFPA Report-2013] web.7June 2014<http//www.unfpa.org

১০. *Marrying to young End Child Marriage* web.7June 2014<http// www.unfpa.org

১১. *Sex ratio* (Source : 1. census 2001; 2. census 2011 provisional results; and 3. 11th five year plan) web.20 Nov.2013<http// www.censusindia.in

১২. সেন, রুশতীঃ "বাঙালি মেয়ের হাল-বেহাল"। *বিশ শতকের বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতি*। সম্পাঃ হর্ষ দত্ত ও স্বপন বসু, পুস্তক বিপণি, কলকাতা ঃ ২০১১, পৃঃ ২০৮

১৩. ভট্টাচার্য, সব্যসাচী ঃ *ঔপনিবেশিক ভারতের অর্থনীতি*, কলকাতা ঃ ১৪১৪, পৃঃ ৫২

১৪. মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার ঃ *রবীন্দ্রজীবনী* (তৃতীয় খণ্ড), কলকাতা ঃ ১৩৫৯, পৃঃ ৮৭

১৫. শাস্ত্রী, শিবনাথ ঃ *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ*, কলকাতা ঃ ১৯৮৩, পৃঃ ৬৮

১৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ ও দাস, সজনীকান্ত (সম্পাঃ) ঃ *ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ নববাবু বিলাস*, সুবর্ণরেখা, কলকাতা ঃ ১৯৭৯, পৃঃ ৪১-৪২

১৭. ঘোষ, বিনয় ঃ *বাংলার নবজাগৃতি*, কলকাতা ঃ ১৩৯১, পৃঃ ৫৭

১৮. তদেব, পৃঃ ৫৭-৫৮

১৯. ঘোষ, বিনয়ঃ *বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা*, কলকাতা ঃ ২০০৭, পৃঃ ১৩২

২০. তদেব, পৃঃ ৩০৩

২১. তদেব, পৃঃ ১২২

২২. তদেব, পৃঃ ১২৩

২৩. তদেব, পৃঃ ১২৩

২৪. শাস্ত্রী, শিবনাথ ঃ প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৮

২৫. ঘোষ, বিনয় ঃ প্রাগুক্ত, ২০০৭, পৃঃ ১১৪-২০

২৬. তদেব, পৃঃ ১২৫

২৭. ভট্টাচার্য, সব্যসাচী ঃ প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৪

২৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ ঃ *বংলা উপন্যাসের কালান্তর*, কলকাতা ঃ ২০০০, পৃঃ ১১৬

২৯. "১৯৪৬-৪৭"। *বেলা অবেলা কালবেলা*, জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা। ভারবি, কলকাতা ঃ ১৯৮৮, পৃঃ ১৩৫

৩০. ঘোষ, বিনয় ঃ প্রাগুক্ত, ২০০৭, পৃঃ ৫৪

৩১. সেনগুপ্ত, সুবোধচন্দ্র ঃ *রবীন্দ্রনাথ*, কলকাতা ঃ ১৩৫৯, পৃঃ ৩১৭

৩২. গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ ঃ *কথাকোবিদ রবীন্দ্রনাথ*, কলকাতা ঃ ১৪১১, পৃঃ ১১৬

৩৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ ঃ প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬৮

৩৪. "বনলতা সেন", *বনলতা সেন*, জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা, কলকাতা ঃ ১৯৮৮, পৃঃ ৫১

৩৫. হোসেন, সৈয়দ আকরম ঃ *রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস ঃ চেতনালোক ও শিল্পরূপ*, কলকাতা ঃ ২০১১, পৃঃ ২৫৮

৩৬. দাশ, অমরেশ ঃ প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১১

৩৭. গুপ্ত, রবীন্দ্রনাথ ঃ প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৬

৩৮. গ্রন্থপরিচয়, *যোগাযোগ*, রবীন্দ্র-উপন্যাস সংগ্রহ, কলকাতা ঃ ১৪০৪, পৃঃ ১৩০০-০১

৩৯. চৌধুরী, ভূদেব ঃ *রবীন্দ্র-উপন্যাস ঃ ইতিহাসের প্রেক্ষিতে*, কলকাতা ঃ ১৯৮৪, পৃঃ ৯৫

৪০. *চিঠিপত্র*, দ্বিতীয় খণ্ড, পত্র - ৩১

৪১. রায়, নীহাররঞ্জন ঃ প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৪০